সুভাষচন্দ্রের জীবনে দেবী দুর্গা

সন্দীপ কুমার দাঁ

বাংলার সুলতান হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) প্রধন উজির ছিলেন দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ গোপীনাথ বসু। হোসেন শাহ তাঁকে পুরন্দর খাঁ উপাধিতে ভূষিত করেন। এই বসু বংশের আদিপুরুষ হলেন দশরথ বসু। দশরথ বসুর অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ হলেন গোপীনাথ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এক স্থান জায়গীর হিসাবে লাভ করেন গোপীনাথ, স্থানটির নাম হয় পুরন্দরপুর। পুরন্দরপুর থেকে সামান্য দূরে মাহীনগর গ্রামে বাস করতেন দশরথ বসুর এক প্রপৌত্র মুক্তি বসু। সেই থেকে এঁরা মাহীনগরের বসু নামে খ্যাত। এই মাহীনগর গ্রামে প্রায় তিনশ বছর আগে বসু বংশের দুর্গোৎসব শুরু হয়। আগে মাহীনগর ও তার সংলগ্ন গ্রামগুলির কাছ দিয়েই হুগলী নদী প্রবাহিত ছিল। নদীপ্রবাহের পরিবর্তন ঘটায় মহামারী দেখা দেয়। ফলে অনেক লোকই গ্রাম পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। বসু বংশের একটি শাখা পাশের গ্রাম কোদালিয়ায় বসতি স্থাপন করেন ১৭৬০ সালে। কোদালিয়ার বাড়িতে বসু বংশের দুর্গোৎসব শুরু হয় আনুমানিক ১৮২০ খৃষ্টাব্দে। এই বংশের উত্তরপুরুষ যাদবেন্দ্রনাথ বসু মাহীনগরের পুজোটি কোদালিয়ায় করতে শুরু করলেন। পরবর্তীকালে তাঁর উত্তরপুরুষ রামহরি বসুর আমলে খুব ধুমধাম সহকারে পুজো হত। রামহরির পৌত্র হরনাথ (যাঁর নামাঙ্কিত কোদালিয়ার বসু বাড়ি— হরনাথ লজ), হরনাথের পুত্র জানকীনাথ, জানকীনাথের পুত্র সুভাষচন্দ্র, আমাদের সকলের প্রিয় নেতাজী।

কোদালিয়ায় বসু-বাড়ির পুজো।

সুভাষচন্দ্র তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী 'ভারতপথিক'-এ তাঁর বাড়ির পুজো সম্বন্ধে লিখেছেন— "... ঐতিহ্যানুসারে আমাদের পরিবার যদিও শাক্ত মতাবলম্বী ছিল, হরনাথ কিন্তু ছিলেন ধার্মিক ও একানিষ্ঠ বৈষ্ণব। দুর্গাপূজা বাঙালী হিন্দুদের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব এবং প্রতি বছর আমাদের বাড়িতে জাঁকজমকের সঙ্গে এই পুজো অনুষ্ঠিত হত। কিন্তু হরনাথ ছিলেন অহিংস স্বভাব বৈষ্ণব। তাই তিনি বাৎসরিক দুর্গাপূজায় (মাতৃমূর্তিতে শক্তির উপাসনা) প্রচলিত পাঁঠাবলি বন্ধ করে দেন। এই নতুন নিয়ম আজও বর্তমান....।"

হরনাথ বসুর দুর্গোৎসবেরও খুবই জাঁকজমক ছিল। জানকীনাথ যখন কটকে আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত, তখন বড়ভাই যদুনাথ হরনাথ লজের পুজো চালিয়েছেন। পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্রের মা প্রভাবতী দেবী ও পিতা জানকীনাথ পুজোর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুভাষচন্দ্র এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "প্রতি বছর কোদালিয়া গ্রামে তিনি (জানকীনাথ) মহাসমারোহের সহিত দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন এবং সেই উপলক্ষে বৎসরান্তে সমস্ত গ্রামবাসীর সহিত মিলনসুখ উপভোগ করিতেন।" মা প্রভাবতী দেবী ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত দুর্গাদালানেই থাকতেন। সকলে খেতে বসলে তিনি মাঝখানে একটি মোড়ার উপর বসে সকলের খাওয়া তদারক করতেন। তাঁর আদেশ ছিল, প্রতিটি ছেলেমেয়েকে কলকাতা বা কটক যেখানেই থাকুন, কোদালিয়ার দেশের বাড়ির পুজোয় আসতে হবে। মায়ের আদেশ প্রত্যেকে মাথা পেতে নিয়েছিলেন। এই পরিবেশে ছোটবেলা থেকে মানুষ হয়েছেন সুভাষচন্দ্র। প্রায় প্রতিবছর পুজোর সময় কোদালিয়ার এই বাড়িতে আসতেন সুভাষচন্দ্র। ছেলেবেলা থেকেই দেবীস্তোত্রের প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক আকর্ষণ। পুজোর ক'দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র স্নান সেরে নতুন জামাকাপড় পরে ভক্তিচিত্তে করজোড়ে দুর্গাদালানে বসে থাকতেন। একাগ্রচিত্তে শুনতেন চণ্ডীপাঠ। পুজো শেষ হলে বালক সুভাষ ভক্তিভরে মায়ের

চরণে অঞ্জলি প্রদান করতেন। এরপর মায়ের চরণামৃত পান করে তিনি জলস্পর্শ করতেন। পুজোর ক'দিন বাড়িতে তিনি ফল বা নিরামিষ ছাড়া অন্য কিছু আহার করতেন না। ঠাকুরদালানে দাঁড়িয়ে অপলক নয়নে দেখতেন, প্রতিমার আরতি, চোখ ভরে যেত জলে। মায়ের উদ্দেশ্যে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বারবার প্রণাম করতেন। কোনও বছর কোনও কারণে বাড়ির পুজোয় আসতে না পারলে তীব্র দুঃখ ও মনোকষ্ট তাঁকে আচ্ছন্ন করত। এরকম এক বছরের পুজোর কথা সুভাষচন্দ্রের চিঠি থেকে জানা যায়। এ ঘটনা ১৯১২ সালের। সুভাষচন্দ্র তখন কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র। সেবছর পুজোর পরেই স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা পড়েছিল। তাই সুভাষের পক্ষে সম্ভব হল না দেশের বাড়িতে গিয়ে পুজো দেখার। কিন্তু পুজোর দিনগুলিতে তাঁর মন পড়ে রইল কোদালিয়ার গ্রামের বাড়ির পূজামণ্ডপে। মা প্রভাবতী দেবী তখন কোদালিয়ায়। পুজো দেখতে না পাওয়ার দুঃখ মাকে প্রাণস্পর্শী ভাষায় চিঠি লিখে জানালেন সুভাষ—

পরমপূজনীয়া শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী
শ্রীচরণকমলেষু মা,

আজ নবমী; সুতরাং আপনি এখন দেশে— দেবীর আরাধনায় নিমগ্ন আছেন।

.... এবার একটা দুঃখ রহিয়া গেল। সেটা বড় বেশি দুঃখ— সাধারণ দুঃখ নহে। এবার দেশে যাইয়া সেই ত্রৈলোক্যপূজ্যা, সর্বদুঃখহারিণী, মহিষাসুরমর্দিনী জগন্মাতা দুর্গাদেবীর সর্বাভরণভূষিতা নানা সাজসজ্জিতা, দেদীপ্যমানা জ্যোতির্ময় মূর্তি দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিতে পারিলাম না; এবার পুরোহিত মহাশয়ের সেই মধুর, পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ বা তাঁহার শঙ্খ ও ঘন্টাধ্বনি কর্ণগোচর করিয়া শ্রবণশক্তি চরিতার্থ করিতে পারিলাম না; এবার কুসুম চন্দন ধূপাদির পবিত্র গন্ধের দ্বারা নাসিকাদ্বয়কে পবিত্র করিতে পারিলাম না; এবার একত্র বসিয়া দেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া রসনেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতে পারিলাম না; এবার পুরোহিত প্রদত্ত কুসুমরাশির দ্বারা স্পর্শেন্দ্রিয়কে ধন্য করিতে পারিলাম না এবং সর্বোপরি 'শান্তিজলে'র অভাবে শান্তিলাভ করিতে পারিলাম না, সবই নিষ্ফল হইল; পঞ্চেন্দ্রিয় নিস্ফল হইল। কিন্তু যদি দেবীর সর্বত্র বিরাজমানা, অম্বরব্যাপিণী মূর্তি দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে মা, সে দুঃখ ঘুচিত— কাষ্ঠপুত্তলিকা দেখিবার ইচ্ছা হইত না; কিন্তু সে আনন্দ, সেইরূপ সৌভাগ্য কয়জনের কপালে ঘটিয়া থাকে। কাজে কাজেই আমার এই দুঃখ রহিয়া গেল।

বিজয়া দশমীর দিন এখানে পড়িয়া থাকিব, কিন্তু মন আপনাদের নিকটেই থাকিবে। এরূপ পুণ্য দিবসে এত আনন্দ হইতে বঞ্চিত রহিলাম। আর উপায় নাই— কল্যরাত্রে আমরা এখান হইতে আপনাদিগকে প্রণাম করিব। আপনি ও বাবা সে প্রণাম গ্রহণ করিবেন ও গুরুজনকে দিবেন।...

আপনার সেবক, সুভাষ।

জগজ্জননী মহামায়ার পুজো-দর্শনে বঞ্চিত বালক সুভাষচন্দ্রের হৃদয়ের ব্যাকুল আকুতি যে সেদিন কতখানি প্রবল ছিল, সেটা তাঁর লেখা এই চিঠি থেকে সহজেই বোঝা যায়। সে বছর কোদালিয়ার বাড়ির পুজোয় পুরোহিত নগেন ঠাকুর অসুস্থতার কারণে পুজো করতে পারেননি। এই পুরোহিতের পুজো এবং চণ্ডীপাঠ ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। নগেন ঠাকুরের অসুস্থতার কথা জানতে পেরে তিনি মা-কে লেখেন, ''.. নগেন ঠাকুর এবার পূজা করেন নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তিনি কি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন? আমি যত পূজা দেখিয়াছি, তন্মধ্যে নগেন ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ গুরুদেব মহাশয়ের পূজা সর্বাপেক্ষা ভক্তি আকর্ষণ করে। নগেন ঠাকুরের চণ্ডীপাঠ বড়ই মধুর এবং অভক্তকে ভক্ত করিয়া তোলে...।''

সুভাষ শৈশব থেকে বাড়িতে দেখেছেন ১৩/১৪ পুরুষ ধরে পরিচালিত দুর্গাপূজা। স্বাভাবিক ভাবেই মা দুর্গার প্রতি শিশুকাল থেকেই তাঁর প্রাণের টান। সে কারণেই হয়ত তাঁর কাছে দুর্গা ছিল প্রিয়তম নাম। বাল্যকাল থেকেই তাঁর সমস্ত চিঠির উপরে লিখতেন, শ্রীশ্রীদুর্গামাতা সহায়। তিনি চাইতেন পুজোয় ভক্তি আর নিষ্ঠাই হোক প্রধান উপাদান। জাঁকজমক, আড়ম্বর তিনি পছন্দ করতেন না। জননীকে এক চিঠিতে তিনি লেখেন, ''... কিন্তু মা জাঁকজমকে প্রয়োজন কি? যাঁহাকে আমরা ডাকি, তাঁহাকে যদি প্রাণ খুলে গদগদ কণ্ঠে ডাকিতে পারি তাহা হইলে যথেষ্ট হইল। আর অধিক কি প্রয়োজন? যে পূজায় আমরা ভক্তি-চন্দন ও প্রেম-পুষ্প ব্যবহার করিতে পারি তাহাই জগতের শ্রেষ্ঠ পূজা। জাঁকজমকের সম্মুখে ভক্তি পলায়ন করে।...''

বাল্যকাল থেকেই সুভাষচন্দ্রের যেমন মাতৃভক্তি ছিল, তেমনই ছিল দেবভক্তি আর সেরকমই ছিল দেশভক্তি। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রজীবন পেরিয়ে রাজনীতি জীবনে এসেছেন, তাঁর ভক্তি বেড়েছে বই কমেনি। এমনই এক নিদর্শন পাই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে লেখা তাঁর এক পত্রে। তিনি লিখেছেন—

''... আমরা মা-কে চাই কেন? তার কারণ এই যে, মা-কে বাদ দিয়া কোনও পূজাই হয় না। আমাদের সমাজের ইতিহাসে যখনই বিপদ-আপদ জুটিযাছে, তখনই মা-র আবাহন করিয়াছি। আমাদের অন্তরের যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহা লইয়াই মাতৃমূর্তি রচনা করিয়াছি। ... মানুষ জীবনে এমন একটি স্থান চায় যেখানে তর্ক থাকবে না— বিচার থাকবে না— বুদ্ধি বিবেচনা থাকবে না, থাকবে শুধু Blind worship । তাই বুঝি 'মা'-র সৃষ্টি। ভগবান করুন যেন আমি চিরকাল এই ভাব নিয়ে মাতৃপূজা করে যেতে পারি।...''

'ভারত পথিক'-এ তিনি লিখেছেন— ''.... দেশী পুজো পার্বণের মধ্যে দিয়ে দলকে গড়ে তোলার এক পরীক্ষায় নামলাম। আমাদের পুজো-পার্বণ চিরকালই গোটা সমাজের উৎসব। যেমন

ধরা যাক দুর্গা পূজা। নিছক পূজাটা যদিও পাঁচদিনের ব্যাপার, তবু তার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটে, সব জাতের, সব ব্যবসার লোকই কাজে লাগে কোনও না কোনও দিকে। এক বাড়িতে পুজো হলেও গোটা গ্রামটা তাতে যোগ দেয়, এমনকি দু'পয়সা উপায়ও করে নিতে ছাড়ে না। আমার ছেলেবেলায় গ্রামে পুজোর শেষদিনে যে যাত্রা হতো তাতে জমায়েত হত গ্রামের ছেলেবুড়ো সবাই। ... আরেক রকমের পালা-পার্বণে সমাজের লোক যোগ দেয় আরও বেশি। সে হচ্ছে বারোয়ারী পুজো। ... ১৯১৭ সালে আমরা নানান দিক ভেবে এক বারোয়ারী পুজোর আয়োজন করলাম। ধূমধাম হল, প্রচুর লোকের উৎসাহ দেখে অন্যান্য বছরও এ ব্যবস্থা বহাল রইল।..." পুজো উপলক্ষে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের আর্থিক উপার্জন বৃদ্ধি পায়, পুজোর এই যে সামাজিক প্রেক্ষাপট এটা তাঁকে খুব আকর্ষণ করত।

পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র কলকাতার কয়েকটি বিখ্যাত বারোয়ারী দুর্গাপুজোর সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে যুক্ত হয়েছেন। কিন্তু সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে সুভাষচন্দ্রের মান্দালয় জেল জীবনের কথা।

১৯২৪ সালে সুভাষ কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ নির্বাচিত হন। এর কয়েক মাস পরে পুজোয় দেশের বাড়ি কোদালিয়ায় আসেন এবং বাড়ির পুজোয় যোগদান করেন। ওই সময় স্থানীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা হয়। দুর্গাপুজোর কিছুদিন পরে ২৫ অক্টোবর সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে আলিপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে কিছুদিন পর বহরমপুর জেল এবং তারপর সেখান থেকে ১৯২৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তাঁকে ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে পাঠানো হয়। সুভাষচন্দ্র তখন মান্দালয় জেলে বন্দী। সহকর্মীদের কাছে তিনি প্রস্তাব দিলেন, জেলের মধ্যে দুর্গাপুজো করার। সেইসময়কার প্রকাশিত 'ফরোয়ার্ড' কাগজ থেকে জানা যায়, জেলে দুর্গাপুজো করার জন্য প্রধান উদ্যোক্তার ভূমিকা নিয়েছিলেন সুভাষ। সেই সময় জেলের সুপার ছিলেন মেজর ফিন্ডলে। তিনি পুজোর অনুমতি দিলেন। এ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন— ''১৯২৫ সালের অক্টোবরে আমাদের জাতির ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপুজো এসে পড়ায় আমরা ওই উৎসব করার জন্য অনুমতি ও অর্থ চেয়ে সুপারিনটেনডেন্টের কাছে আবেদন করলাম। যেহেতু ভারতীয় জেলে খৃস্টান বন্দীদের অনুরূপ সুবিধা দেওয়া হত সেজন্য তিনিও আমাদের আবশ্যক সুবিধাদি দেন..।" মেজদা শরৎচন্দ্র বসুকে সুভাষ ১৮.৮.২৫ তারিখে চিঠিতে লেখেন, ''...আমার মনে হয় আপনি পুজোর সপ্তাহে কোদালিয়ায় যাবেন। এখানে আমরা দুর্গাপুজো উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করছি।..." এরপর মেজবৌদি বিভাবতী বসুকে ১১.৯.২৫ তারিখে এক পত্রে এ প্রসঙ্গে লেখেন, ''... এখানে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হচ্ছে। আশা করি এখানেই মায়ের পূজা করতে পারব। তবে খরচ নিয়ে কর্তৃপক্ষের সহিত ঝগড়া চলছে, দেখা যাক কি হয়। পূজার কাপড় এখানে পাঠাতে যেন ভুল না হয়— বিজয়া দশমী যখন এখানেই কাটবে।..."

মহা উৎসাহে পুজোর আয়োজন চলতে লাগল। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন যেহেতু বর্মা দেশে সাধারণ পুজো করার মতোই বাঙালী পুরোহিত পাওয়া যায় না, সেহেতু বাংলাদেশ থেকে দুর্গাপুজোর জন্য পুরোহিত আনাতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি বাংলা সরকারের চিফ সেক্রেটারিকে প্রেরণ করার জন্য একটি চিঠি লিখেছিলেন (যদিও চিঠিটি, যে কোনও কারণেই হোক, প্রেরণ করা হয়নি)। চিঠিটি এ প্রসঙ্গে এখানে তুলে দিচ্ছি—

কোদালিয়ার বাড়িতে সুভাষের ঘর।

চিফ সেক্রেটারি,
বাংলা সরকার,

প্রসঙ্গ : দুর্গোৎসব।

প্রিয় মহাশয়,

আশা করি আপনি জ্ঞাত আছেন যে, আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর দুর্গা পূজা শুরু হচ্ছে। এই উৎসবটি হিন্দুরা, বিশেষ করে বাংলাদেশের সব হিন্দু উদ্‌যাপন করে। সারা বছরের পূজানুষ্ঠানের এটিই হল সবচেয়ে বড়। এই উৎসবটি পাঁচদিন ধরে চলে এবং অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকর্ম এত ব্যাপক আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার হয়ে পড়ে।

এই পূজানুষ্ঠানটি আমরা এখানে পালন করব বলে মনস্থ

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন :—

ANU
SAREES

করেছি, সুতরাং এ ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আপনাকে। এই উৎসব খাতে .... টাকা প্রয়োজন, সরকারি অনুদান হিসেবে ওই অর্থ আমাদের দেবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমাদের বলা হয়েছে যে, সাধারণ পূজার্চনা করার মতো বাঙালী পুরোহিত এখানে পাওয়া যায় না। দুর্গা পূজা করা বেশ কঠিন কাজ এবং সাধারণ পুরোহিতদের মধ্যে সামান্য কয়েকজনই এই পূজা সম্পন্ন করতে পারেন। সুতরাং এই পূজার জন্য বাংলাদেশ থেকে একজন পুরোহিত নিয়ে আসা দরকার। অতএব বাংলাদেশ থেকে যথাসময়ে একজন পুরোহিত আনাবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদি নিতে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনাকে।

আশা করি বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আপনি যথোচিত ব্যবস্থা নেবেন।

বিনীত,

এস সি বসু

পুজোর আগে এক চা চক্রে সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেল সুপার ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ জানান। পুজোর দিনগুলিতেও তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই আমন্ত্রণ পত্রের অংশবিশেষ—

সুপারিনটেনডেন্ট, ২১.৯.২৫

মান্দালয় জেল

প্রিয় মহাশয়,

আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমাদের পক্ষ থেকে দুর্গাপূজা উপলক্ষে ডেপুটি কমিশনার, বর্মার ম্যাজিস্ট্রেট এবং বর্মার অন্যান্য বে-সরকারি অতিথিদের আগামী শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটের চা-চক্রে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান, বাধিত হব। আমাদের আমন্ত্রিতদের তালিকায় অবশ্যই আপনি আছেন, আশা করি আপনি আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন।

.... আপনি আমন্ত্রণপত্রে আমাদের পক্ষ থেকে এই অনুরোধও জানাবেন, যদি আমন্ত্রিতদের মধ্যে কেউ কেউ পূজার অন্যান্য দিনে অর্থাৎ ২৪-২৭-এর মধ্যে আসতে চান, আমরা তাঁদেরও সাদরে গ্রহণ করব....

বিনীত,

এস সি বোস

(রাজনৈতিক বন্দীদের পক্ষ থেকে)

জেলের মধ্যে সুভাষচন্দ্র কেন দুর্গাপূজা করতে চেয়েছিলেন? পুজোর পরে মেজবৌদিকে লেখা এক পত্রে এর উত্তর মেলে। তিনি লিখেছেন, ''... দুর্গামূর্তির মধ্যে আমরা মা-স্বদেশ-বিশ্ব সমস্তই পাই। তিনি একাধারে জননী, জন্মভূমি ও বিশ্বময়ী।'' আর একটি পত্রে সুভাষ হরিচরণ বাগচীকে লেখেন—

''... ভয় জয় করার উপায় শক্তি সাধনা। দুর্গা, কালী প্রভৃতি মূর্তি শক্তির রূপ বিশেষ। শক্তির যে কোনও রূপ মন মনে কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিলে এবং তাঁহার চরণে মনের দুর্বলতা ও মলিনতা বলি স্বরূপ প্রদান করিলে মানুষ শক্তিলাভ করিতে পারে। আমাদের মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, সেই শক্তির বোধন করিতে হইবে। পূজার উদ্দেশ্য— মনের মধ্যে শক্তির বোধন করা। প্রত্যহ শক্তিরূপ ধ্যান করিয়া শক্তিকে প্রার্থনা করিবে এবং পঞ্চেন্দ্রিয় ও সকল রিপুকে তাঁহার চরণে নিবেদন করিবে। পঞ্চপ্রদীপ অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মায়ের পূজা হইয়া থাকে।...'' ১৯২৫ সালে মান্দালয় জেলে অনুষ্ঠিত রাজবন্দীদের করা এই দুর্গাপুজো সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। সুভাষচন্দ্রের লেখা এবং সুভাষচন্দ্রকে লেখা বিভিন্ন জনের চিঠির ভেতর থেকে টুকরো টুকরো কিছু ছবি পাওয়া যায়। শোনা যায়, পুজোর তিনদিন সুভাষচন্দ্র জেলের মধ্যে শুদ্ধাচারে চণ্ডীপাঠ করতেন। পুজোও সঠিকভাবে নিয়ম মেনেই সম্পন্ন হয়েছিল। এই পুজো সম্বন্ধে পুজোর মহাষ্টমীর দিনে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর স্ত্রী বাসন্তী দেবীকে এক পত্র লেখেন। সেই পত্রের কিছুটা এখানে তুলে দিচ্ছি—

মান্দালয় জেল

২৫.৯.২৫

শ্রীচরণেষু মা,

... আজ মহাষ্টমী। আজ বাংলার ঘরে ঘরে মা এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে আজ জেলের মধ্যেও তিনি এসে দেখা দিয়েছেন। আমরা এই বৎসর এইখানেই শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করিতেছি। মা বোধহয় আমাদের কথা ভোলেন নাই, তাই এখানে এসেও তাঁহার পূজা-অর্চনা করা সম্ভবপর হইয়াছে। পরশুদিন আবার আমাদের কাঁদিয়ে মা চলে যাবেন। জেলখানার অন্ধকারের মধ্যে নির্জীবতার মধ্যে— পূজার আলো, পূজার আনন্দ বিলীন হয়ে যাবে। এইরূপে কয় বৎসর কাটবে জানি না। তবে মা যদি এসে বৎসরান্তে একবার দেখা দিয়ে যান, তবে কারাবাস দুর্বিসহ হইবে না ভরসা করি।

এ চিঠি যখন আপনার নিকট পৌঁছাবে তখন বিজয়া দশমী চলে গেছে। বিজয়ার সময়ে সকলের ভক্তি ও প্রণাম আপনার নিকট পৌঁছাবে। সঙ্গে সঙ্গে যদি আমার যৎকিঞ্চিৎ ভক্তির অর্ঘ্য আপনার নিকট পৌঁছায়— আর প্রতিদানে যদি একটিবার আমি নীরব আশীষ লাভ করি তবে আমি ধন্য হইব।

ইতি,

আপনার সেবক—

শ্রীসুভাষ

এই পুজোয় সুভাষচন্দ্র তো বটেই, সকল বন্দীই প্রভূত আনন্দ লাভ করেছিলেন। পুজোর পরে এক চিঠিতে সুভাষ মেজবৌদিকে এক চিঠিতে লেখেন— ''এত আনন্দ কোনও পূজাতে পেয়েছি কিনা জানি না। আর অনেক ঝগড়াঝাঁটি করে আমরা পূজা করবার অনুমতি পাই, তাই বোধহয় পূজার মধ্যে বেশি আনন্দ পাই। কতদিন জেলে কাটাতে হবে তা জানি না। তবে বৎসরান্তে যদিও মা'র

দর্শন পাই তবে সব দুঃখ সহ্য করতে পারব।"

পুজোর পর মেজদা শরৎচন্দ্র বসু সুভাষকে ৮.১০.২৫ তারিখে এক চিঠিতে লেখেন— "... তোমরা ওখানে দুর্গোৎসব পালন করেছ জেনে আমরা খুব খুশি হয়েছি। পুরোহিতের কাজ কে করেছিলেন? তুমি এবং তোমার মান্দালয়ের সহবন্দীদের জন্য ন'টি ধুতি এবং ন'টি চাদরের একটি পার্সেল পাঠিয়েছিলাম। আশা করি বিজয়ার দিন কিংবা তার আগেই সেটি তোমার কাছে পৌঁছেছে।"

সুভাষচন্দ্রের পিতা জানকীনাথও সুভাষকে ১৩.১০.২৫ তারিখে এক পত্রে এই প্রসঙ্গে লেখেন— ".... তুমি আমার এবং তোমার মায়ের বিজয়ার আশীর্বাদ নিও। কোদালিয়ায় দুর্গাপূজা ভালভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে, কোনও কাজে কোনওরকম বিঘ্ন হয়নি... তোমরা মান্দালয় জেলে দুর্গোৎসব করেছ জেনে খুশি হলাম। বিভিন্ন খবরের কাগজে এই উৎসবের রিপোর্ট আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেছি।"

পুজোর আগে শরৎচন্দ্র সুভাষকে কিছু ধুতি ও চাদর পাঠান। যা তাঁর লেখা চিঠি থেকে জানা যায়। এ প্রসঙ্গে সুভাষ মেজবৌদিকে লেখেন— "... পূজার কাপড় যা পাঠিয়েছিলেন তা পেয়ে আমরা সকলে খুব আনন্দ করেছি। পূজার সময় পৌঁছায়নি বটে, কিন্তু তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? মাসের মধ্যে আমাদের ৩০ দিনই ছুটি। আপনাকে আলাদা করে বিজয়ার প্রণাম জানাতে পারি নাই। মেজদাদার পত্রে জানিয়েছিলাম। আশা করি রাগ করেন নাই।" পরে এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র সুভাষকে এক পত্রে লেখেন— "... খদ্দরের ধুতি ও চাদরের পার্সেলটি শেষপর্যন্ত তোমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং ওই সামান্য পূজা-উপহার তোমাদের ভাল লেগেছে জেনে আমরা খুব খুশি হয়েছি। খবরের কাগজ পড়ে জানলাম যে তোমাদের দুর্গা প্রতিমার মূর্তিটি সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে। পূজার খরচ চালাবার জন্য সরকার থেকে কি খরচ পেয়েছ তোমরা?"

এই পুজোর মূর্তি কিংবা পুরোহিত কিভাবে জোগাড় করা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। অতঃপর খরচ প্রসঙ্গ। মান্দালয় জেলের সুপার মেজর ফিন্ডলে পুজোর অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর আশা ছিল যে এই প্রস্তাবে সরকারি অনুমোদন পাওয়া যাবে। কিন্তু বৃটিশ সরকার যে কেবল ওই অনুমোদন দান করা থেকে বিরত থাকলেন তা নয়, সুপারিনটেনডেন্ট মেজর ফিন্ডলে নিজে দায়িত্ব নিয়ে একাজ করেছেন বলে তাঁকে ভর্ৎসনাও করলেন। মান্দালয় জেলে সেবছর দুর্গাপূজা করতে বন্দীদের খরচ হয়েছিল মোট সাতশ' টাকা। কিন্তু এত টাকা বন্দীরা কোথায় পাবেন? নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে তাঁরা মাত্র ১৪০ টাকা তুলতে পেরেছিলেন। বাকি ৫৬০ টাকা তাঁরা জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের কাছে পূজা-অনুদান হিসাবে দাবি করলেন। মেজর ফিন্ডলে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে ওই টাকা অগ্রিম হিসাবে মঞ্জুর করেন। তিনি আশা করেছিলেন, সরকার এই টাকার অনুমোদন দেবে। সুপার ফিন্ডলে বন্দীদের এই দাবির ব্যাপারে সহানুভূতিশীল ছিলেন, তাই টাকাটা পাওয়ার জন্য সরকারের কাছে বন্দীদের আবেদনটি পাঠিয়ে দেন।

ডিসেম্বর মাসে এক পত্রে সুভাষচন্দ্র মেজবৌদিকে এ প্রসঙ্গে লেখেন— "আমি মেজদাদাকে পূর্বে জানিয়েছিলাম যে, দুর্গাপূজার খরচের টাকা বোধহয় সরকার থেকে দেওয়া হবে। এখন আমরা হুকুম পেয়েছি যে, আমাদের পকেট থেকে দিতে হবে। আমরা বলেছিলাম যে ৫০০ টাকা সরকার থেকে দেওয়া হোক— বাকি টাকা আমরা দেব। আমাদের প্রতিশ্রুত অংশ আমরা দিয়ে বসে আছি। কিন্তু ৫০০ টাকার এক পয়সা আমরা দিতে পারব না— এবং দেবো না।..."

সুভাষচন্দ্র 'বর্মার জেলে (১৯২৫-১৯২৭)' নামক এক প্রবন্ধে এই ঘটনা সম্বন্ধে লিখেছেন— "... আমরা সরকারকে জানালাম যে তাঁরা যেন তাঁদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেন, অন্যথায় আমরা অনশন ধর্মঘট চালাতে বাধ্য হব।"

শেষপর্যন্ত মেজর ফিন্ডলের অনুমান মিথ্যা বলে প্রমাণিত হল। বৃটিশ সরকার সেই আবেদন তো নাকচ করলই উপরন্তু এক নির্দেশ জারি করে ওই ওই ৫৬০ টাকা রাজবন্দীদের ভাতা থেকে কেটে সরকারি তহবিলে জমা করতে বলে। এর অর্থ দাঁড়ায়, জেল কর্তৃপক্ষ আগাম যে টাকাটা মঞ্জুর করেছিল, সেই টাকা রাজবন্দীদের পাওনা টাকা থেকে কেটে নেওয়া হবে। এই নির্দেশে রাজবন্দীরা ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। সুভাষচন্দ্র সবাইকে জানালেন, কোনওমতেই টাকা ফেরত দেবেন না। এর আগে যে দাবিপত্র বন্দীরা পাঠিয়েছিলেন, তাতে তাঁরা লিখেছিলেন, "... এখানে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না, ওই জেলে খৃস্টান কয়েদীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য বছরে ১২০০ টাকা দেওয়া হয় (১৯১৯-২০ সালের ভারতীয় জেল কমিটি বিবরণের তৃতীয় খণ্ডের ৭৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বাংলার জেল কয়েদী এবং রাজবন্দীদের সরকারি খরচে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের সুযোগ দেওয়া হয়— আমরা এ তথ্যও আপনাদের জানিয়েছি। (এই দাবিপত্রে সুভাষচন্দ্র ছাড়া যাঁরা সই করেছিলেন, তাঁরা হলেন সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, মদনমোহন ভৌমিক, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী, জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবী)।

সুভাষচন্দ্র লিখেছেন— "... নেতিবাচক জবাব এলে আমরা ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনশন ধর্মঘট শুরু করলাম। তৎক্ষণাৎ বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের সমস্ত চিঠিপত্রের আদান-প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হল। এতৎসত্ত্বেও ফরোয়ার্ড পত্রিকা আমাদের এই অনশন ধর্মঘটের খবর এবং সেইসঙ্গে সরকারের কাছে আমরা যে চরমপত্র পাঠিয়েছিলাম তাও প্রকাশ করে দিল। প্রায় এই সময়েই ১৯১৯-১৯২১ সালের ভারতীয় জেল কমিটির রিপোর্ট থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি ওই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই

কোদালিয়ায় সুভাষের পৈতৃক ভিটে।

কমিটির কাছে কারা বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার লেঃ কর্ণেল মালভ্যানি সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন, ''তিনি তাঁর জেলের রাজবন্দীদের মধ্যে কয়েকজনের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, তা প্রত্যাহার করে নিয়ে তার বদলে মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়ার জন্য উপরওয়ালা অফিসার, বাঙ্গলার ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ প্রিজন্স তাঁকে বাধ্য করেছেন। এইসব খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ায় দেশবাসীর মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের আলোড়ন শুরু হয়। সেই সময় দিল্লীতে ভারতীয় আইনসভার অধিবেশনকালে স্বরাজ্যপন্থী এক সদস্য শ্রীতুলসী চন্দ্র গোস্বামী মান্দালয় জেলে অনশন ধর্মঘটের কারণে সভা মুলতুবী রাখার প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং এই মর্মে লেঃ কর্ণেল ম্যালভিনের সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, কারা বিভাগ রাজবন্দীদের সম্পর্কে মিথ্যা রিপোর্ট তৈরি করেছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে পড়েন এবং অনশনকারী রাজবন্দীদের দাবিগুলির প্রতিকারের আশ্বাস দেন। আইনসভার বিতর্কের পরিসমাপ্তি ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই কিভাবে ফরোয়ার্ড খবর সংগ্রহ করল তা বের করার জন্য জোর তদন্তকার্য শুরু হয়। যে যাই হোক, সরকার অবিলম্বে এই আদেশ প্রচার করলেন যে, আমরা যে অর্থ ব্যয় করেছি, তারা তা মঞ্জুর করবেন এবং ভবিষ্যতে আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে সুবিধা ও অর্থের ব্যবস্থা করা হবে। অতএব পনের দিন অনশনের পর আমাদের দাবির জয় হওয়ায় ধর্মঘটের অবসান হয়।'' মান্দালয় জেলের অভ্যন্তরে দুর্গাপুজো করাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা অভূতপূর্ব। শুধু তাই নয়, এই আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁরা জেলের অভ্যন্তরে তিনটি উৎসবের অনুমতি আদায় করলেন— দুর্গাপুজো, সরস্বতী পুজো এবং দোলযাত্রা।

মেজদা শরৎচন্দ্র বসুকে এক পত্রে সুভাষচন্দ্র লেখেন— ''... গভর্ণমেন্ট ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির জন্য প্রতি বছরে মাথা পিছু ৩০ টাকা দিতে মনস্থ করেছেন। আদেশের প্রকৃতি এতই সর্বজনীন যে মনে হয় সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য। প্রকৃত লাভ হল এই যে, নীতির প্রশ্নে গভর্ণমেন্ট পরাজয় স্বীকার করেছেন। যথাসময়ের আগে ধর্মঘট প্রত্যাহার না করলে ভাতার পরিমাণ হয়ত অনেক বেশী হত।'' সহকর্মী অনিল বিশ্বাসকে এক পত্রে তিনি লেখেন— ''... আপনি বোধহয় ইতিপূর্বে শুনিয়াছেন যে, আমাদের অনশন ব্রত একেবারে নিরর্থক বা নিষ্ফল হয় নাই। গভর্নমেন্ট আমাদের ধর্ম বিষয়ে দাবি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অতঃপর বাংলাদেশের রাজবন্দী পূজার খরচ বাবদ বাৎসরিক ত্রিশ টাকা অ্যালাউন্স পাইবেন। ত্রিশ টাকা অতি সামান্য এবং ইহা দ্বারা আমাদের খরচ কুলাইবে না, তবে যে প্রিন্সিপল্ গভর্নমেন্ট এতদিন স্বীকার করিতে চান নাই, তাহা যে এখন স্বীকার করিয়াছেন, ইহাই আমাদের সবচেয়ে বড় লাভ, টাকার কথা সর্বক্ষেত্রে সর্বকালে

iitrade
Institute of International Trade

ADMISSIONS GOING ON

BBA + CA & MBA

1. Guaranteed Placement for deserving candidates
2. Education Loan Facility Available
3. Free Laptop, books and study material

For more details call +91 98302 01772 or visit www.IITRADE.com

EN - 27, Salt Lake City; Sector 5, Kolkata – 700 091; WB, India

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই—

Geeta SAREES

Golden Collection

M/s. Sharda Textiles

অতি তুচ্ছ কথা। পূজার দাবি ছাড়া আমাদের অন্যান্য অনেকগুলি দাবিও গভর্নমেন্ট পূরণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবের ভাষায় কিন্তু বলিতে গেলে আমাকে বলিতে হইবে 'এহ বাহ্য'। অর্থাৎ অনশন ব্রতের সবচেয়ে বড় লাভ, অন্তরের বিকাশ ও আনন্দ লাভ— দাবি পূরণের কথা, বাহিরের কথা, লৌকিক জগতের কথা। suffering ব্যতীত মানুষ কখনও নিজের অন্তরের আদর্শের সহিত অভিন্নতা বোধ করিতে পারে না এবং পরীক্ষার মধ্যে না পড়িলে মানুষ কখনও স্থির নিশ্চিতভাবে বলিতে পারে না, তাহার অন্তরে কত অপার শক্তি আছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে আমি নিজেকে আরও ভালভাবে চিনিতে পারিয়াছি এবং নিজের উপর আমার বিশ্বাস শতগুণে বাড়িয়াছে।...."

শুধু ১৯২৫ সালেই নয়, ১৯২৬ সালেও সুভাষচন্দ্ররা মান্দালয় জেলে দুর্গাপূজা করেছিলেন। ২.৯.২৬ তারিখে সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেল থেকে এক পত্রে মেজদা শরৎচন্দ্রকে লেখেন— ''...আমরা মূর্তি তৈরির কাজ শুরু করেছি এবং দুর্গা পূজার জন্য তৈরি হবার চেষ্টা করছি।" এরপর বিজয়া দশমীর দিন মেজদাদাকে লেখা সুভাষচন্দ্রের এক পত্রে ঐ বছরের পুজোর কিছু কথা জানা যায়। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন— ''...দুর্গাপূজার প্রস্তুতি নিয়ে আমরা ব্যস্ত ছিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের ব্যবস্থাদি সন্তোষজনকই হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত পুজো সফল। ঘটনা বিবর্জিত এবং একঘেয়ে জীবনে অভ্যস্ত একজনের কাছে দুর্গাপুজোর মতন অনুষ্ঠানের সাধারণ মূল্যের চাইতে অনেক বেশি। সৌন্দর্যসমৃদ্ধ আনন্দের জ্ঞানসমৃদ্ধ আমোদ-প্রমোদের এবং ধর্মীয় অনুপ্রেরণার উৎস এই অনুষ্ঠান যা স্থায়ী সান্ত্বনাও দেয়। আজ বিজয়া দশমী। সারা বাঙ্গলা দেশে, একই মায়ের সন্তান— আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এমনকি শত্রুও কিছুক্ষণ পরেই একে অন্যের সঙ্গে সৌভ্রাত্রের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হবে।.... পূজার ধুতি ও চাদর আমরা এ বছর ঠিক সময়ে পেয়েছি।... বিজয়ার অভিনন্দনের সঙ্গে আমাদের সকলের ধন্যবাদ জানিয়ে দিতে আমাকে বলা হয়েছে— কেননা উপহার এখান সমাদরে গৃহীত হয়েছে। আমার বিজয়ার প্রণাম গ্রহণ করবেন, গুরুজনদের প্রণাম জানাবেন এবং ছোটদের ভালোবাসা।".. ১৯২৭ সালে সুভাষচন্দ্র বর্মার জেল থেকে ছাড়া পান।

এরপর কলকাতায় এসে দলের কাজের পাশাপাশি প্রচুর সামাজিক ও সেবামূলক কাজে সুভাষ জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে এই সামাজিক কাজের সূত্র ধরেই বেশ কিছু বারোয়ারী দুর্গাপূজার সঙ্গে যুক্ত হন। সুভাষ গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে দেবী পূজার প্রাঙ্গণকে বেছে নিলেন। বিভিন্ন সময়ে বারোয়ারি পূজার কাজে নিজেকে জড়ালেন। দক্ষিণ কলকাতার আদি লেক পল্লীর পুজো, মধ্য কলকাতার ৪৭-এর পল্লীর পুজো, উত্তর কলকাতার বাগবাজার, কুমারটুলি, সিমলা ব্যায়াম সমিতি— এই বারোয়ারী পুজোগুলির সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন সময় যুক্ত হলেন।

দক্ষিণ কলকাতার আদি লেকপল্লীর দুর্গাপুজোয় সুভাষচন্দ্র উপস্থিত হতেন সেখানকার পল্লীবাসীদের মধ্যে একতা আর জাতীয় চেতনা গড়ে তুলতে। এই পুজোর উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য ছিল, দুর্গা পুজোকে উপলক্ষ করে এই অঞ্চলের মানুষের মনে স্বদেশী ভাবধারা জাগিয়ে তোলা। এই পুজোর প্রাঙ্গণে পুজোর ক'দিন স্বদেশী গান-বাজনার ব্যবস্থা হত। স্বাধীনতা সংগ্রামী চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই পল্লীর পুজোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁরই আহ্বানে সুভাষচন্দ্র এখানকার পুজোয় উপস্থিত হতেন। শুধু সুভাষচন্দ্রই নন, চারুচন্দ্রের আহ্বানে প্রতি বছরই আরও অনেক বিপ্লবী এখানে আসতেন এখানকার বাসিন্দাদের জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে। সুভাষচন্দ্র এই পুজো প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলে তাঁকে দেখার জন্য মানুষের ঢল নামত। স্বেচ্ছাসেবকদের হিমসিম খেতে হত সেই ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য। স্থানীয় পুলিশ সব জেনেও না জানার ভান করে চুপ করে থাকত।

১৯২৯ খৃস্টাব্দে মধ্য কলকাতার ৪৭-এর পল্লীর পুজো শুরু হয়। বর্তমান হিন্দ সিনেমার উল্টোদিকের মাঠে এঁদের পূজাপ্রাঙ্গণ। এখানে প্রতিমা হয় অকালবোধনের ঘটনা দিয়ে। সেইজন্য এখানে দুর্গামূর্তির পাশে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ থাকেন না। তার বদলে এখনে মায়ের পাশে দেখা যায় রাম, লক্ষ্মণ আর বিভীষণকে। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এই পুজোর উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। প্রথম বছরের পুজো উদ্বোধন করতে উদ্যোক্তারা সুভাষচন্দ্রকে আহ্বান জানান। সুভাষচন্দ্র সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রথম বছরের অকালবোধনের পুজো উদ্বোধন করেন। সে বছর ত্রিকোণ পার্কের এই পূজাপ্রাঙ্গণে ভীড় ভেঙে পড়েছিল সুভাষচন্দ্রকে দেখতে।

ঋষি অরবিন্দ ও বাঘা যতীনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী যুগান্তর দলের নেতা বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসু সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। দেশমাতৃকার আরাধনার উদ্দেশ্য নিয়ে অতীন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালে এখানকার দুর্গোৎসব শুরু করেন। সারা বছরের শরীর আর সাহসিকতার চর্চার পরীক্ষার দিন হিসাবে বেছে নেওয়া হত মহাষ্টমীর দিনটিকে। দেবী দুর্গার সামনে সাহস অঅর শক্তি দেখানোর পরীক্ষা হত লাঠিখেলা, ছুরিখেলা, কুস্তি, মুষ্ঠিযুদ্ধ আর তরবারি খেলার মাধ্যমে বীরাষ্টমী অনুষ্ঠানে। ১৯২৮ সালের সিমলা ব্যায়াম সমিতির তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, সে বছর খুব জাঁকজমক করে বীরাষ্টমী উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। বীরাষ্টমী পুজোর দিন উপস্থিত থাকতেন শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণ মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মতো ব্যক্তিরা। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এই বারোয়ারী পূজা কমিটির গভীর সম্পর্ক ছিল। এখানকার বীরাষ্টমী উৎসবের উদ্বোধন করেছেন কোনও কোনও বছরে। সে সময় মহাষ্টমীর দিন এখানে অন্নকূট

উৎসব হত। অন্যান্য বিপ্লবীর সঙ্গে অন্নকূট উৎসবে প্রসাদ পেতে আসতেন সুভাষচন্দ্র। ১৯৩৮ সালের অন্নকূট উৎসবে সুভাষচন্দ্র তাঁর মেজদাদা শরৎচন্দ্র ও রাজেন্দ্র দেবের সঙ্গে আসেন এবং সকলের সঙ্গে মাটিতে বসে পংক্তি ভোজনে অন্নকূটের প্রসাদ গ্রহণ করেন। সেবার তদারকিতে ছিলেন বিপ্লবী হেমন্ত কুমার বসু। ১৯৩৮ সালের অন্নকূট উৎসবের পংক্তিভোজনে বসে সুভাষচন্দ্রের প্রসাদ গ্রহণের ছবি আজও এই সমিতির কার্যালয়ে সযত্নে রক্ষিত আছে।

সিমলা ব্যায়াম সমিতির পুজোয় প্রতিমা তখন অদি বস্ত্র পরানো হত। পুতুল ও অন্যান্য খেলার প্রদর্শনীর মাধ্যমে রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হত। বিভিন্ন বাণী লেখা পোস্টার শোভা পেত। ইংরেজি কাগজ 'অ্যাডভান্স' এখানকার এই দুর্গাপ্রতিমাকে 'স্বদেশী ঠাকুর' আখ্যা দিয়েছিল। এই সমিতি ছিল লাঠিখেলা, কুস্তি, অসিচালনা প্রভৃতি শেখার সর্বপ্রথম সংগঠিত আখড়া। বৃটিশ সরকার ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করত না। কিন্তু বিপ্লবীদের অংশগ্রহণ বেড়ে যাওয়ায় ১৯৩২, ১৯৩৩ এবং ১৯৩৪ সালে তারা এই পুজোকে অবৈধ ঘোষণা করে।

১৯৩০ সালে সিমলা ব্যায়াম সমিতি সুভাষচন্দ্র বসুকে প্রথম কোনও সর্বজনীন পুজো কমিটির সভাপতি পদে নিযুক্ত করে। ১৯৩৯ সালে স্বামী বিবেকানন্দের ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত সর্বপ্রথম এখানকার পুজোয় একচালার ঠাকুরকে পাঁচচালার ঠাকুরে পরিণত করেন। রক্ষণশীলরা এর প্রতিবাদ করলেও অতীন্দ্রনাথ এতে কর্ণপাত করেননি। ওই বছরই ওর্য়াধা থেকে কংগ্রেস সুভাষচন্দ্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এই নিয়ে সর্বত্র তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে জনসভা করে এর তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। সিমলা ব্যায়াম সমিতির সংগঠকরা সুভাষচন্দ্রকে প্রতিমার আবরণ উন্মোচনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। নেতাজি গৌহাটি থেকে ফিরে এসে প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করেন। সংগঠকদেরও প্রতিমা নিয়ে সব সংশয়ের অবসান হয়।

বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গোৎসব শুরু হয় বাংলা ১৩২৬ সাল অর্থাৎ ১৯১৯ খৃস্টাব্দে। শোনা যায়, কয়েকজন যুবক কোনও বাড়ির পুজো দেখতে গিয়ে অপমানিত হয়ে এই সর্বজনীন পুজো শুরু করার উদ্যোগ নেন। 'নেবুবাগান বারোয়ারি দুর্গাপূজা' নামে এই পুজো শুরু হয়। ১৯২৯ সালে বাগবাজারের বুড়োশিবতলার মাঠে স্বদেশী আন্দোলনের প্রেরণায় ১৯২৯ সালে এই পুজো কমিটি 'বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব' স্বদেশী শিল্পমেলার আয়োজন করে। ১৯৩০ সালে কুমোরটুলি সলিসিটর দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পরিচালনায় এই পুজোকে রেজিস্ট্রি করা হয়। স্বদেশী শিল্পকে আইন করে পুজোর সঙ্গে যুক্ত করলেন দুর্গাচরণ, দেশাত্মবোধ ও স্বাদেশিকতা জাগাতে এই পুজোর নামকরণ করেন, 'বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনী'। প্রকৃতপক্ষে এই বছর থেকেই এই পুজোর গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের শুরু। এই বছর থেকে সুভাষচন্দ্র এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত হন। সুভাষচন্দ্র তখন কলকাতার মেয়র। তিনি চারুশিল্প, কারুশিল্প, কুটির শিল্পকে এই প্রদর্শনীর সঙ্গে যুক্ত করেন গ্রামীণ শিল্পের সঙ্গে কলকাতার মানুষের পরিচয় করাতে (এই প্রদর্শনী এখনও হয়, তবে চরিত্রে অনেক বদল হয়েছে)।

১৯৩৬ সালে সরলা দেবীর পরিচালনায় বাগবাজারে সর্বপ্রথম বীরাষ্টমী উৎসব শুরু হয়। দুর্গানগরের এই উৎসব দু'ঘন্টা চলার পর সুভাষচন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, 'কাপুরুষতা ভীরুতা সব মায়ের চরণে অর্পণ করে দেশমাতৃকার পূজার জন্য তৈরি হতে হবে। সে পূজার জন্য প্রয়োজন শুধু ত্যাগ।'

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এই পুজোর সূচনা বলে দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল স্বদেশভাবনার জাগরণ। সুভাষচন্দ্র ছাড়াও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার এবং আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি যুক্ত ছিলেন এই পুজোর সঙ্গে। সেইসময় অনুশীলন সমিতির লাঠিখেলা, শরীর চর্চা ইত্যাদি প্রদর্শন করার জায়গা ছিল বাগবাজার সর্বজনীন পূজা প্রাঙ্গণ এবং এই অনুষ্ঠানটি হত বীরাষ্টমী অনুষ্ঠানে (উল্লেখ্য, আজও মহাষ্টমীর দিনে বীরাষ্টমী উদ্‌যাপিত হয়)। সুভাষচন্দ্র ১৯৩৮-৩৯ সালে এই দুর্গোৎসবের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসবের পরিসমাপ্তি অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ১৯৩০ এবং ১৯৩৯ সালে।

পরাধীন ভারতবর্ষ তখন স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তাল। বিরাট জনসমাগম দেখলেই ইংরেজরা ভয় পেতে শুরু করে। এভাবেই বারোয়ারী পুজোর মাধ্যমেও বহু মানুষকে একত্রিত করার পরিকল্পনা তখন পরাধীন দেশের বিভিন্ন অংশে শুরু হয়ে যায়। খানিকটা এভাবেই উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৩২ সালে অর্থাৎ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে হরিমোহন পালের সভাপতিত্বে এবং সম্পাদক দ্বারিকানাথ দাসের নেতৃত্বে কুমোরটুলি অঞ্চলের কিছু যুবক কুমারটুলি সর্বজনীন দুর্গোৎসবের শুভ সূচনা করেন।

সুভাষচন্দ্রের এই পল্লীতেও যাতায়াত ছিল তৎকালীন কমিশনার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে। সুভাষচন্দ্র এই সর্বজনীন পুজো কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন ১৯৩৮ সালে। সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে কুমোরটুলির পুজো নতুন মাত্রা পায়। ওই বছর তিনি যখন সভাপতি নির্বাচিত হন, তখন এই পূজা কমিটির আগের চার বছরের যিনি সভাপতি ছিলেন সেই স্যার হরিশঙ্কর পালের সঙ্গে সামান্য হলেও মতপার্থক্য দেখা দেয়। এবং তার পরিণতিতে শেষপর্যন্ত কুমোরটুলিতে পাশাপাশি দুটো পুজোর ব্যবস্থা হয়। পঞ্চমীর দিন আকস্মিকভাবে স্যার হরিশঙ্কর পালের পূজা মণ্ডপটি ভস্মীভূত হয়। কুমারটুলির মণ্ডপেও আগুন আসে এবং আগুনে মণ্ডপ ও প্রতিমার ক্ষতি হয়। সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে মণ্ডপটি মেরামত করে পুনরায় নির্মাণ

করা হয়। নতুন মণ্ডপটি তৈরি হয় পাহাড়ের ওপর যুদ্ধক্ষেত্রের আদলে। যা দেখে দর্শনার্থীরা মোহিত হয়ে যান। সুভাষচন্দ্রের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রতিমা গড়তে এলেন ভাস্কর গোপেশ্বর পাল। লণ্ডন ফেরত এই শিল্পী সুভাষচন্দ্রকে কথা দেন যে, তিনি এক রাতের মধ্যেই প্রতিমা গড়ে দেবেন। তবে এক চালচিত্রে প্রতিমা গড়া সম্ভব হবে না দেখে নতুন চিন্তাভাবনা ও প্রয়োগরীতি আরোপ করে আলাদা আলাদা কাঠামোতে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ তৈরি করলেন। প্রাচীন ঘোড়ার মাথাওয়ালা দেবসিংহের পরিবর্তে তৈরি হল থ্যাবড়ামুখো লায়ন। এই বছরের পুজোর অসাধারণ আয়োজনে পল্লীর মানুষ মুগ্ধ হয়ে ১৯৩৯ সালে আবার সুভাষচন্দ্রকে অনুরোধ করেন সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করার জন্য এবং সুভাষচন্দ্র সেই অনুরোধ রক্ষা করে দ্বিতীয়বারের জন্য সভাপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন। তাই এই দুটি বছর কুমোরটুলির মানুষের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

যে পূজামণ্ডপটি আগুনে ভস্মীভূত হয়েছিল, সেই পুজো পরের বছর থেকে গোঁসাইপাড়ায় নতুন করে শুরু হয়। পর পর দু'বছর সুভাষচন্দ্র এই পূজা কমিটির সভাপতি থাকার পর স্যার হরিশঙ্কর পাল আবার এই পূজা কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন।

কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলে অবস্থিত প্রখ্যাত আইনজীবী গণেশচন্দ্রের বাড়ির দুর্গাপুজো শুরু হয় ১৮৭৭ সালে। আগে বাবু কালচারের অঙ্গ হিসাবে এখানে জাঁকজমক আর আড়ম্বরের সঙ্গে ছিল যাত্রা আর বাঈ-নাচ। মূলত সাহেবসুবো আর বড়লোকদের দেখানোর জন্য। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে শুরু হল পট পরিবর্তন, চন্দ্র পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন রাজনৈতিক মুক্তি সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সক্রিয় হলেন। দুর্গাপুজোর সামাজিক মিলনোৎসবের চেহারাটাই বদলে গেল। গণেশচন্দ্রের নাতি নির্মলচন্দ্র (যাঁর নামাঙ্কিত এবাড়ির সামনের রাস্তা) ছিলেন বাংলার প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতাদের একজন। এবড়ি তখন হয়ে উঠল পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক কার্যকলাপের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। কে না তখন এসেছেন এখানে? দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, এমনকী মহাত্মা গান্ধীও এখানে সভা করেছেন ঠাকুরদালান সংলগ্ন উঠানে। পুজোবাড়ি তখন হয়ে উঠেছিল নেতাদের আলাপ-আলোচনা এবং পরামর্শ ও মতামত বিনিময়ের আদর্শ স্থল, অগ্রজ নেতাদের মিলন স্থল। সুভাষচন্দ্র যেমন দেবী দুর্গার টানে আসতেন, তেমনই আসতেন অগ্রজ নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনার জন্যও।

১৮৪২ সালে দিল্লীতে শাহজানাবাদের কোনও এক স্থানে ভবানী মজুমদার নামে এক ব্যক্তি প্রথম দুর্গাপুজো করেন। তবে সার্বজনীন পূজার প্রথম সূত্রপাত হয় কাশ্মীরি গেট অঞ্চলে, শুরু হয় 'দিল্লি দুর্গাপূজা সমিতি' ১৯১০ সালে। এটিই দিল্লির প্রাচীনতম সার্বজনীন দুর্গা পুজো। ১৯১১ সালে প্রথম মূর্তি তৈরি করে পুজো শুরু হয় এখানে। সেবার মূর্তি এসেছিল বারাণসী থেকে। ১৯৩৮ সালে দুর্গাপূজার সময়ের ঘটনা। মহাষ্টমীর দিন সেবার সুভাষচন্দ্র দিল্লিতে ছিলেন। মহাষ্টমীর সন্ধ্যায় তিনি এবং প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা দিল্লি দুর্গাপূজা সমিতির কাশ্মীরী গেটের পুজোয় আসেন এবং শক্তিপূজার ওপরে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। দেখা যাচ্ছে, শুধু দেশের বাড়ি বা কলকাতাতেই নয়, প্রবাসে থাকাকালীনও যখনই সুযোগ হয়েছে মা দুর্গার আরাধনায় তিনি ছুটে গেছেন।

ত্রিশের দশকে সুভাষচন্দ্র বেশ কিছু বারোয়ারি দুর্গাপূজার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেও নিজের দেশের বাড়ির পুজোকে কখনোই ভুলে যাননি। পুজোর দিনগুলোতে যখনই সময় সুযোগ হয়েছে, তিনি ছুটে গিয়েছেন কোদালিয়ায় দেশের বাড়ির পুজোর টানে। এরকম এক বছরের ঘটনা। সুভাষচন্দ্র তখন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়েছেন। বৃটিশ পুলিশ তখন তাঁকে খুঁজছে গ্রেপ্তারের জন্য। তিনি আত্মগোপন করে চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। শারদীয়া মহাষ্টমীর দিনে সবার অলক্ষ্যে সুভাষচন্দ্র হাজির হলেন কোদালিয়ার বাড়িতে। মায়ের চরণে মহাষ্টমীর পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। এরপর তিনি চলে গেলেন ওই বাড়ির দোতলায় তাঁর নিজস্ব ঘরে। এমন সময় পুলিশ এসে হাজির। পুলিশ যে তাঁর সন্ধানে এখানে আসতে পারে, এমন আশঙ্কা ছিলই। পুলিশ এসেছে খবর পেয়ে সুভাষ নিমেষে উধাও হয়ে গেলেন। সারা বাড়ি এমনকি সারা কোদালিয়া গ্রাম খুঁজেও পুলিশ সুভাষকে খুঁলে পেল না। আর সুভাষ? তিনি ছদ্মবেশে গ্রামের অন্য সবার মাঝে দাঁড়িয়ে পুলিশকে বোকা বানানোটা দারুণভাবে উপভোগ করলেন। তবে পুলিশ চলে যাবার পরই কালবিলম্ব না করে সেদিন কোদালিয়া ত্যাগ করেন। গ্রেপ্তারের ঝুঁকি নিয়েও তিনি পুজোবাড়িতে এসেছিলেন, এমনই ছিল তাঁর গর্ভধারিণী এবং মা দুর্গার প্রতি টান। এ ঘটনা সুভাষের ইউরোপ যাওয়ার আগের।

এরপর ১৯৩৭ সালে পুজোর মহাষ্টমীর দিনে সুভাষের কোদালিয়া আসার খবর জানা যায়। সুভাষচন্দ্র কোদালিয়ায় এলেই স্থানীয় বিপ্লবীরা যেমন, হরিকুমার চক্রবর্তী, শৈলেশ্বর বসু, অমূল্য নন্দী প্রমুখ তাঁর সঙ্গে দেখা করে পরামর্শ করতে আসতেন। সেবার মহাষ্টমীর পুষ্পাঞ্জলি দেবার পর বাড়ির সকলের সঙ্গে একসঙ্গে বসে তিনি আহার করেন। এরপর দোতলায় নিজের ঘরে বিপ্লবীদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করে কোদালিয়া ত্যাগ করেন।

১৯৩৯ সালে ৩ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। সেবছর দুর্গাপুজোর মহাষ্টমীর দিনের প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রগুলির শিরোনাম ছিল 'সুভাষচন্দ্র বসু ঢাকা যাত্রা করিলেন'। স্বভাবতই কোদালিয়ার বাড়ির ও অন্যান্য পরিজনদের মন খারাপ, কারণ সুভাষ পুজোয় আসছেন না। কিন্তু বেলা ১১টা

নাগাদ সুভাষচন্দ্র কোদালিয়ার বাড়িতে এসে হাজির। সকলে অবাক, বয়োজ্যেষ্ঠরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার, কাগজে দেখলাম তুমি ঢাকায় গেছ, আর তুমি এখানে?' তিনি উত্তর দেন— 'ওটা রাত ন'টার খবর। টিকিট রিজার্ভেশন, যাওয়ার ব্যবস্থা সবই ছিল। কিন্তু গেলাম না।' মহাষ্টমীর দিনটি পরিবারের সকলের সঙ্গে তিনি মহানন্দে কাটান। যতদূর জানা যায়, এটিই কোদালিয়ার পুজোয় সুভাষচন্দ্রের শেষবারের মতো অংশগ্রহণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর তিনি বলতেন, এই আমাদের সময় এসেছে, এই সময় সুযোগ ছেড়ে দিলে ভারতকে আর স্বাধীন করা যাবে না। তাই হয়ত স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে শেষবারের মতো পৈতৃক ভিটের পুজোয় অংশগ্রহণ করে মা দুর্গার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে যান। এরপর তো দেশত্যাগ করে চিরদিনের মতো চলে যান।

এযাবৎ যা কিছু বলা হল সবই সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগের আগের ঘটনা। দেশত্যাগের পর এবং সুভাষচন্দ্রের থেকে নেতাজী হবার পর তিনি দুর্গাপুজোর দিনগুলি কিভাবে কাটিয়েছেন সে সম্বন্ধে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। তবে চরম ব্যস্ততার মাঝে দুর্গাপুজোর দিনে সামান্য সময় মিললে হয়তো অন্তরেই দুর্গা ধ্যান করেছেন।

দুর্গা তাঁর প্রিয়তম নাম। তাঁর ধ্যান-ধারণায় জননী, জন্মভূমি ও মা দুর্গা একাকার হয়ে গিয়েছেন। বিপদের সময় দুর্গানামকেই পাথেয় করে এগিয়েছেন। দুর্গাপুজোর মাধ্যমে তিনি যে নিজের প্রিয়তম মাতৃভূমি দেশজননীরই আরাধনা করতে চেয়েছিলেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সহায়ক গ্রন্থ ও রচনাপঞ্জী :—

(১) সুভাষ রচনাবলী, সুভাষ স্মৃতি এবং রাধারমণ রায় ও বিমলকুমার ভট্টাচার্য রচিত প্রাসঙ্গিক রচনাগুলি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার — নির্মল চট্টোপাধ্যায়, কুমারটুলি, দেবীদাস চৌধুরী, কোদালিয়া, অর্পণ চক্রবর্তী। □

Modern Jewellers
House of Ladies Garments
and
Fancy Jewellery

VIP Market, Shop No. 28
Opposit Pantaloon
Phool Bagan, Kolkata - 700 054

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

Trend Vyapaar Ltd.

(Unit : KELVIN JUTE MILLS)

H. O. : Netaji Subhas Road, 1st Floor, Kolkata - 1
Ph. & Fax : 22312970/2971/2972
E-mail : trendtvl20@yahoo.com

তিলকের প্রথম কারাবাস
শিবাজী উৎসব ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

গুরুপদ শাণ্ডিল্য

১৮৫৬ সালের ২৩ জুলাই মহারাষ্ট্রের রত্নগিরিতে নিষ্ঠাবান চিৎপাবন ব্রাহ্মণ পরিবারে লোকমান্য তিলকের জন্ম। তিলকের প্রপিতামহ কেশবরাও পেশোয়াদের অধীনে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। ১৮১৮ সালে পেশোয়া ইংরেজদের নিকট পরাস্ত হলে কেশবরাও বিধর্মী বিদেশী শাসকদের দাসত্ব করতে অস্বীকার করেন। তিলকের পিতামহ রামচন্দ্র পরিণত বয়সে সন্ন্যাসগ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেছিলেন এবং কাশীতে দেহরক্ষা করেন।

বাল্যে পিতামহর সান্নিধ্য ও শিক্ষা তিলককে ধর্মনিষ্ঠ, আদর্শবাদী, তেজস্বী ও দৃঢ়চেতা করে গড়ে তোলে। পিতামহই তাঁকে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতি, প্রাচীন ভারত ও মারাঠা জাতির গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত ও শ্রদ্ধাশীল করেছিলেন।

তিলকের পিতা গঙ্গাধর শাস্ত্রী সংস্কৃত, গণিত ও ব্যাকরণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সামান্য ২৫ টাকা বেতনে রত্নগিরির বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। একদা মহারাষ্ট্রের এই ধনী ও অভিজাত পরিবার মারাঠা রাজত্বের অবসানে নিম্নবিত্ত পরিবারে পর্যবসিত হন।

বাল্যকাল থেকেই তিলকের মধ্যে প্রগাঢ় আত্মসম্মানবোধ, অসামান্য মেধা, সত্যনিষ্ঠা এবং অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ১৮৭২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিলক পুণার বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডেকান কলেজে ভর্তি হন। এর আগের বছর তিনি পিতার নির্দেশে বিবাহ করেন।

১৮৭৬ সালে তিলক অঙ্কশাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষায় কৃতিত্বের সঙ্গে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন। ১৮৭৯ সালে তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

পিতৃপিতামহের আদর্শে উদ্বুদ্ধ তিলক লোভনীয় সরকারি চাকুরি প্রত্যাখ্যান করেন। জনজাগরণের প্রয়াসে নিজেকে উৎসর্গ করাই তাঁর দৃঢ়সংকল্প ছিল। ১৮৮০ সাল থেকে চিপলংস্কর, আগরকর ও নামযোশীর সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি আদর্শ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে ব্রতী হন। কোনও সরকারি সাহায্য ব্যতীত নিজেদের শ্রম ও নিষ্ঠা দ্বারা তিলক এমনভাবে বিদ্যালয়টি সংগঠিত করেছিলেন যে শিক্ষা কমিশনের সভাপতি স্যার উইলিয়ম হান্টার ১৮৮২ সালের সেপ্টেম্বরে বিদ্যালয় পরিদর্শন করে লেখেন— "Throughout whole of India, I have not yet witnessed a single institution of this nature which can be compared with this establishment. This institution, though not receiving any aid from the Government, can rival and compete with success, not only with Government High Schools in this country, but compare favourably with the Schools of other countries also"।

এই বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে সংস্কৃত আবশ্যিক ছিল।

প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও সমাজ সংস্কারক চিপস্করের সঙ্গে তিলক, গোপাল গণেশ আগরকর পুণা থেকে ১৮৮১ সালের ৪ জানুয়ারি সাপ্তাহিক মারাঠী পত্রিকা 'কেশরী' ও ইংরাজী সাপ্তাহিক 'মারাঠী' পত্রিকা কেশরী ও ইংরাজি সাপ্তাহিক 'মারাঠা' প্রকাশ করেন। ১৮৮৫ সালে চিপলংকরের নেতৃত্বে তিলক ও তাঁর সঙ্গীরা ডেকান এডুকেশন সোসাইটি ও ফার্গুসন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তরুণ তিলক উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষার অভাব দেশের এই ভয়ানক দুর্দশার জন্য দায়ী। যৌবনের প্রারম্ভে তিলক সুহৃদ আগরকরকে বলেছিলেন,

"We were men whose plans were at fever heat, whose thoughts are of the degraded condition of our country and after a long thought we come to the conclusion that the salvation of our motherland lay in the education and only education of the people"।

মারাঠী ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'কেশরী' পত্রিকার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল—

"The mass of ignorant people who have generally no idea of what passes around them and who, wherefore, must be given the knowledge of such topics as concerned thier averyday life by writings on literary, social, political moral and economic subjects"।

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত মারাঠা পত্রিকার আবেদন ছিল শিক্ষিত শ্রেণী প্রতি। তাদের মধ্যে দেশপ্রেম এবং স্বদেশচিন্তাকে জাগিয়ে তোলাই ছিল 'মারাঠা' পত্রিকার লক্ষ্য— "... the more advanced portion of the community, who require to be provided with material for thinking intelligently on the important topics of the day"।

কেশরী ও মারাঠা পত্রিকা দুটি ডেকান এডুকেশন সোসাইটি দ্বারা পরিচালিত হতো। ডেকান এডুকেশন সোসাইটিকে কেন্দ্র করে আগরকরের সঙ্গে তিলকের মতপার্থক্য দেখা দেয়। আগরকর সমাজ সংস্কারকে প্রাধান্য দিতেন। তাঁর অভিমত ছিল প্রথমে সমাজকে সংস্কার করেই রাজনৈতিক দাবি উত্থাপন করা উচিত। তিলক লক্ষ্য করেছিলেন সমাজ সংস্কারকে কেন্দ্র করে বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট সহায়তায় মিশনারিরা হিন্দুধর্ম ও সমাজের উপর আগ্রাসী আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। তিলক শুধুমাত্র সমাজ ও ধর্মের উপর এই সম্মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন না, দেশবাসীর রাজনৈতিক অধিকারের দাবিতে, স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার বিপক্ষে 'কেশরী' ও 'মারাঠা'র ছত্রে ছত্রে অগ্নিবর্ষী ভাষায় সুস্পষ্ট প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণ করলেন। ১৮৯০ সালে তিনি ডেকান এডুকেশন সোসাইটি ত্যাগ করে কেশরী ও মারাঠাকে সম্পূর্ণ নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। পাশ্চাত্য ভাবধারা যাতে হিন্দু সমাজকে কলুষিত না করতে পারে, সেজন্য মিশনারিদের অপপ্রচার ও অবাঞ্ছিত ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে এবং সেইসঙ্গে দেশের সীমাহীন দুর্দশা ও দারিদ্র্যের জন্য বিদেশী বিধর্মী স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করে জনচিত্তকে জাগ্রত করার আদর্শে পত্রিকা দুটিকে পরিচালনা করেন।

মারাঠারা ইংরাজের কাছে পরাজিত হয়েছিল ভারতের অন্যত্র ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক পরে ১৮১৮ সালে, যা ছিল তিলকের আবির্ভাবের ৫০ বছরেরও কম সময় পূর্বে। সুতরাং স্বাধীন মারাঠা রাজ্যের গৌরবময় স্মৃতি— অপরাজেয় মহাপরাক্রমশালী বিদেশী মোগলদের বিরুদ্ধে শিবাজী মহারাজের

মহাসংগ্রামের বিরাট জয়ের স্মারক, তখনও সাধারণ মারাঠাদের স্মৃতিতে অমলিন হয়ে যায়নি।

তিলক তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে হিন্দু সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে ইংরেজ শাসকদের হাতে মারাঠাদের লাঞ্ছনার ইতিহাস, পরাধীনতার গ্লানি ও বিধর্মীদের দ্বারা দেশের অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপর নিষ্ঠুর আঘাতের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছিলেন। বৃটিশ সমর্থক স্যার সৈয়দ আহমেদের দ্বারা প্রভাবিত মুসলমান সমাজ জাতীয়তাবাদী দেশাত্মবোধক আন্দোলনের বিপক্ষে ক্রমশ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে শক্তিসঞ্চয় করছিল। এরাও তিলকের কেশরী পত্রিকার আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। অল্পকালের মধ্যেই মহারাষ্ট্রের যুব সমাজের মধ্যে কেশরী পত্রিকা হয়ে উঠল অসাধারণ জনপ্রিয়, আর তিলক পেলেন মহারাষ্ট্রের জনচিত্তের রাষ্ট্রনেতার আসন— রাজাসন বললেও অত্যুক্তি হবে না। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাঁকে দর্শন করা পুণ্যকর্ম মনে করত।

জনগণের এই জাগৃতিকে লক্ষ্য করে তিলক আরও উৎসাহী হয়ে উঠলেন। ১৮৯৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে প্রবর্তন করলেন গণপতি উৎসব। মহারাষ্ট্রে পেশোয়াদের আমলে মহা ধুমধামের সঙ্গে সারা দেশে গণপতির পূজা সম্পন্ন হত। মারাঠাদের চোখে সবচেয়ে প্রিয় দেবতা ও হিন্দু ধর্মের রক্ষাকর্তা হলেন গণপতি বা গণেশ। গণপতি উৎসবকে উপলক্ষ করে বিধর্মী ইংরেজ শাসনে পরিপোষিত খৃষ্টধর্ম প্রচারকদের প্রচার থেকে এবং ম্লেচ্ছ মুসলমানদের আক্রমণ থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার জন্য প্রচার চলতে থাকল। যুবকদের এক একটি দল গণপতির মূর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা বের করত। শোভাযাত্রা থেকে পথে পথে জ্বালাময়ী ভাষায় ইংরেজ-বিরোধী বক্তৃতা দেওয়া হত, ধ্বনি দেওয়া হত। স্কুলের অল্পবয়সী ছাত্ররাও শোভাযাত্রায় সামিল হত। তারা ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করার জন্য শপথ গ্রহণ করত। শোভাযাত্রাসমূহ মূল সভাস্থলে মিলিত হলে নেতারা প্রকাশ্য সভায় ভাষণ দিতেন। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে যুবকরা শরীরচর্চা, ছুরি খেলা ও বিভিন্ন কসরৎ অনুশীলন করতেন। তাদের সমবেত আবৃত্তির জন্য রচিত হয়েছিল গণপতি শ্লোক—

''হায়! তোমার লজ্জা নেই। তাহলে তোমার আত্মহত্যা করাই উচিত। হায়! এই কসাইয়া দানবীয় নিষ্ঠুরের ন্যায় গোমাতা ও গোবৎসদের হত্যা করে। তোমরা এই যন্ত্রণা থেকে গোমাতাকে রক্ষা করার জন্য বদ্ধপরিকর হও। মৃত্যুবরণ কর; কিন্তু তার আগে ইংরেজদের হত্যা কর। অসল হয়ে বসে থেকে ধরিত্রীর বোঝা বাড়িও না। আমাদের দেশের নাম যদি হিন্দুস্থান হয়, তবে ইংরেজরা এখানে রাজত্ব করে কোনও অধিকারে?''

তিলক গণপতি উৎসব প্রবর্তন করেছিলেন ধর্মীয় উৎসব হিসাবে। মুসলমানদের দাঙ্গা ও খৃস্টান মিশনারিদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি গণপতি উৎসবের মাধ্যমে হিন্দু সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

গণপতি উৎসবের আশাতীত সাফল্য লক্ষ্য করে তিলক পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। প্রখর দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক বাস্তববোধ ছিল তিলকের। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত জাতীয় কংগ্রেস সাধারণ ভারতবাসীর ভাবাবেগ স্পর্শ করতে এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পথে প্রবাহিত করতে অক্ষম ও উদাসীন। তাঁদের হৃদয়কে উদ্দীপিত করতে হলে প্রয়োজন নিঃস্বার্থ, ত্যাগী, সাহসী এবং আপোষবিরোধী মহৎ চরিত্রের উদাহরণ সামনে নিয়ে আসা। ১৮৯৫ সালের এপ্রিল মাসে শিবাজী মহারাজের রাজধানী রায়গড়ে তাঁর স্মৃতিমন্দিরের ভগ্নদশার উল্লেখ করে অবিলম্বে ওই স্মৃতিমন্দিরের সংস্কার করার জন্য কেশরী পত্রিকায় অর্থ সাহায্যের আবেদন করা হয়। মহারাষ্ট্রের মুক্তিদাতা এবং হিন্দু জাতির অভিভাবক শিবাজী মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মত অবশ্যকরণীয় কর্তব্যপালনের জন্য ঐ স্মৃতিমন্দিরের পুনর্গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত আবশ্যক তিলক একথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন। শিবাজীর পুণ্য স্মৃতিরক্ষার্থে তিলকের পরিকল্পনা অনুসারে রায়গড়ের সংস্কার তিলক তাঁর জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু সরকারি বাধা সত্ত্বেও ১৮৯৬ সাল থেকে শিবাজী উৎসব পালন করার প্রথা তিনি প্রচলিত করে গেছেন অভাবনীয় সাফল্যের সঙ্গে, যা হয়ে উঠেছিল মহারাষ্ট্রের সমাজজীবন ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সে বছর শিবাজী উৎসব শুধু ২-৩ দিন ধরে জনসাধারণের প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে মহাসমারোহে পালিত হয়নি, তার জন্মলগ্ন থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল প্রথমে মহারাষ্ট্র ও পরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। এই উৎসবকে তিলক রাজনৈতিক উৎসব বলে অভিহিত করেছিলেন। সমবেত আবৃত্তির জন্য রচিত 'শিবাজী শ্লোক' এ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জাতীয় যুদ্ধের সংগ্রাম ক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।

''শিবাজীকে দেবতাজ্ঞান করে তাঁর বীরত্বের কাহিনী আবৃত্তি করলেই স্বাধীনতা আসবে না। শিবাজী ও বাজীরাওয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সত্বর দুঃসাহসিক কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।''

''তোমরা তাঁদেরই যোগ্য সন্তান। সমস্ত জেনে শুনে এখন তোমাদের তরবারির ও বর্ম ধারণ করতে হবে।''

''তোমরা শুনে রাখ। জাতীয় যুদ্ধের সংগ্রাম ক্ষেত্রে আমরা আমাদের জীবন উৎসর্গ করব। আমাদের ধর্মনাশক শত্রুর রক্তে পৃথিবীর মৃত্তিকা লাল করে দেব।''

''আমরা আমাদের শত্রু-নিধন করে তবেই প্রাণ বিসর্জন দেব, আর তোমরা কি স্ত্রীলোকের মতো নিশ্চেষ্ট হয়ে আমাদের বীরত্বের কাহিনী শুনবে?''

১৮৯৫ সালে ২৭ ডিসেম্বর পুণায় জাতীয় কংগ্রেসের একাদশতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তিলক শিবাজী উৎসবকে সর্বভারতীয় রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা করে আগত কংগ্রেস নেতাদের শিবাজী উৎসব সমর্থন করার অনুরোধ করেন। এক

সূর্য্য

সূর্য্য টিউব হল সর্বশ্রেষ্ঠ 5 স্টার রেটিং প্রাপ্ত টিউব

15 বছর* পর্যন্ত চলে

চোখের জন্য অত্যন্ত আরামদায়ক

UPTO **85%** সাশ্রয়

বছরে 600 টাকার বিদ্যুৎ সাশ্রয়

** Compared to GLS bulb

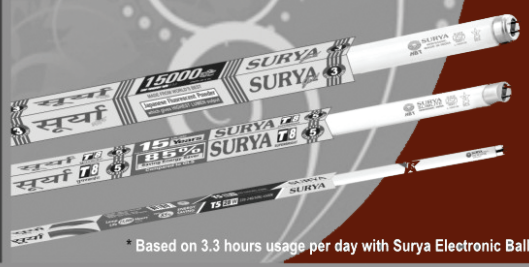

* Based on 3.3 hours usage per day with Surya Electronic Ballast

বছরের পর বছর ধরে চলে, মজবুত হওয়ার প্রতিশ্রুতির ফলে

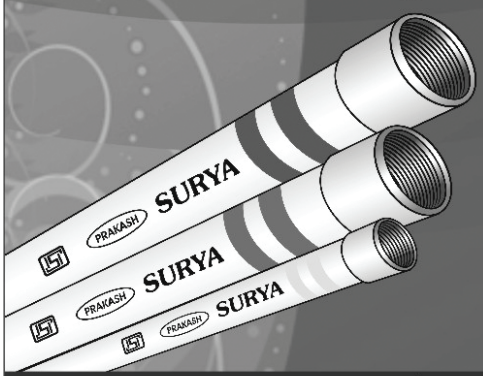

প্রকাশ

সূর্য্য

ষ্টীল পাইপস্

SURYA

Email : consumercare@sroshni.com
Website : www.suryaroshnilighting.com

বিশাল জনসমাবেশে ১৫ হাজারেরও বেশি লোকের উপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাগ্মীশ্রেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ব লিখিত বক্তৃতা ফেলে রেখে জনতার ভাবাবেগ আবেক্ষণ করে এক অসাধারণ বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাকে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে 'জীবনের গৌরবময় স্মৃতি' রূপে চিহ্নিত করেছেন। ''পুণায় প্রদত্ত অভিভাষণ সকলের প্রশংসা লাভ করে।... পূর্বরচিত বক্তৃতাটি ত্যাগ করিয়া বিশাল জনতা ও শ্রোতৃবৃন্দের ভাবাবেগের মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করি। তখন আর বক্তা শ্রোতাদের অনুপ্রাণিত করে নাই, পরন্তু শ্রোতৃবৃন্দই বক্তাকে অনুপ্রেরণা দিতেছিলেন। মনে হইল, সত্যই যেন এক বৈদ্যুতিক শক্তি আমাকে তাহাদের সহিত যোগ করিয়াছে... কোনও অদৃশ্য শক্তি ওই যুবকদের পূর্বপুরুষদের বর্তমান কালের বিশাল হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপন করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহা যেন সেই মুহূর্তে অতীতের কুহেলিকা ভেদ করিয়া আমার নিকট উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমার জীবনে ইহা এক গৌরবময় স্মৃতি।''

সভাতে সুরেন্দ্রনাথ ছাড়া মদনমোহন মালব্য, আনন্দ চার্লু ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিশিষ্ট নেতারা বক্তৃতা দেন। সভার বিস্তৃত বিবরণী ও বক্তৃতাসমূহ মারাঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। ৫ জানুয়ারি, ১৮৯৬ সংখ্যায় মারাঠার সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলা হয়—

''সভায় কেবল মারাঠারা যোগ দেননি, পাঞ্জাব, বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধরা সমবেত হয়ে শিবাজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। শিবাজী স্মৃতি আন্দোলনের কুৎসা করে কোনও কোনও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমালোচক বলেছেন, এ কেবল মহারাষ্ট্রীয় আন্দোলন, অন্য প্রদেশবাসীর এই আন্দোলনের প্রতি কোনও সাহনুভূতি নেই। গত রবিবারের সভা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে, এই আন্দোলনের প্রতি ভারতের সকল প্রদেশের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। এই সভা আরও প্রমাণ করেছে... মারাঠা ডিচ সত্ত্বেও বাঙালীরা, স্বীয় পূর্বপুরুষদের উপর শিবাজীর নিষ্ঠুর আচরণ সত্ত্বেও মাদ্রাজীরা, সুবিপুল ভাবে লুণ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও গুজরাটিরা অতীতকে ভুলে বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় বীরকে সম্মান করতে প্রস্তুত।''

বস্তুতঃ এই সভার মাধ্যমে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শিবাজী

উৎসব পালনীয় ও আদরণীয় হয়ে ওঠে। মুম্বাই বৈভব পত্রিকা এপ্রিল ১৮৯৬ সালে লিখেছিল– "festival is spreading like contagion from place to place"। আর সিডিসন কমিটির রিপোর্টে পরবর্তীকালে (Sedition Committee Report, 1918) বলা হয়— "Indication of a revolutionary movement was first observed in western India in connection with the development of two classes of annual festival, nanuly those in the honour of Hindu God Ganapati and those in the honour of Maratha leader Sivaji, Page I, 1918)।

শাসকগোষ্ঠীর পত্র পত্রিকা ব্যাপকভাবে গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসবের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। ''গণপতি উৎসব আপেক্ষিকভাবে মিশনারি দংশন বেশি লাভ করে, আর শিবাজী উৎসব শাসক দংশন।"

শাসক শ্রেণী ছাড়াও তিলককে রাণাডের মতো উদারপন্থী হিন্দু সমাজ সংস্কারকদের প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গণপতি উৎসবের মধ্যে তাঁরা আবিষ্কার করেন, প্রাচীন হিন্দু গোঁড়ামি ও অপসংস্কৃতি। আর গোড়া কংগ্রেস সমর্থক, যাঁরা নির্দ্বিধায় নিজেদের রাজভক্ত বলে এবং ইংরেজ শাসনের স্থায়ীত্বকে ভারতের মহামঙ্গলদায়ক বলে প্রচার করতে পশ্চাৎপদ হতে চাইতেন না, তাঁরা এই উৎসবকে মুসলমান-বিরোধী বলে সনাক্ত করলেন। তিলক এসব সমালোচনার মুখের মতো জবাব দিয়েছিলেন কেশরী পত্রিকার মাধ্যমে। গ্রীস এবং রোমের ইতিহাসের উদাহরণ উল্লেখ করে ওই দেশ দুটিতে জাতির ঐক্য বিধান ও জাগরণের ক্ষেত্রে অলিম্পিয়ান ও পাইথিয়ান উৎসবের ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন সমালোচকদের। সমাজ সংস্কারকরা, যাঁরা তিলকের নিন্দায় সততই মুখর এবং তাঁর ভ্রান্তিমূলক চরিত্র চিত্রণ করতে পটু, তাঁদের তীব্র ব্যঙ্গ করে তিলক বলেন, যদি রাণাডে প্রার্থনা সমাজের সভাগৃহে সমাজসংস্কারকদের সঙ্গে চুপ করে চোখ বন্ধ করে বসে না থেকে গণপতি উৎসবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে জ্ঞানের দেবতার সামনে বক্তৃতা দিতেন অথবা স্বামী রামদাসের মতো সন্ন্যাসীর বার্ষিক অনুষ্ঠানে খোলামনে অংশগ্রহণ করে জাতীয় কর্তব্য পালনে রত শত শত মানুষের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করতেন, তাহলে সেটা দেশের অনেক বেশি কাজে লাগত।

রাজনীতিবিদদের উষ্মাকে লক্ষ্য করে তিলক বললেন—

"There is nothing wrong in providing a platform for all the Hindus of all high and low classes to stand together and discharge a joint national duty"। জাতীয় কর্তব্য পালনের জন্য হিন্দু সমাজের উচ্চ-নীচ সমস্ত বর্ণের মানুষকে একত্রিত করার উদ্যোগ কোনওক্রমেই অন্যায় হতে পারে না। তাঁকে সাম্প্রদায়িক তক্‌মা দেওয়ার অবিরত প্রয়াসে যাঁরা রত ছিলেন তাদের মুখবন্ধ হয়ে গিয়েছিল আই সি এস আমলা মন্টগোমারীর তদন্তের প্রতিবেদনে। মন্টগোমারী তদন্ত করে জানিয়েছিল যে, গো-হত্যা নিবারণী আন্দোলনে বা ১৮৯৩ সালের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় তিলকের কোনও প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না। এমনকি সর্বভারতীয় মুসলিম আন্দোলনের নেতারা, আলি ভ্রাতারা তিলককে 'রাজনৈতিক গুরু' আখ্যায় ভূষিত করেছিল।

সমাজ সংস্কারের আন্দোলন মহারাষ্ট্রে প্রবল হয়ে উঠেছিল সে সময়। ১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রার্থনা সমাজের বাংলার কেশব সেনের প্রভাবিত ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন। কিন্তু প্রার্থনা সমাজের অনুগামীরা কখনও ব্রাহ্মধর্ম পালন করেননি, তাঁরা ছিলেন মহারাষ্ট্রের নামদেব, তুকারাম ও সমর্থ রামদাস স্বামীর অনুগামী। ধর্ম নিয়ে নয়, তাঁরা বিড়ম্বিত ছিলেন সমাজ সংস্কারের কাজে। অসবর্ণ বিবাহ, ছুৎ-অচ্ছ্যুৎ বর্ণবিভাগের বিরুদ্ধে একসঙ্গে আহার, বিধবা বিবাহ, মহিলা সমাজের ও অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নতি বিধান ইত্যাদি কর্মসূচীর দ্বারা দেশের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল আতুরাশ্রম, অনাথআশ্রম, নৈশশিক্ষা কেন্দ্র, বিধবাশ্রম ইত্যাদি গড়ে তোলা ও নিপীড়িত শ্রেণীর উন্নয়নের প্রচেষ্টা। ন্যায়মূর্তি মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে (১৮৪২-১৯০১) ছিলেন প্রার্থনা সমাজের মধ্যমণি। তিলক সমাজসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতেন না। কিন্তু সমাজসংস্কারের অছিলায় ইংরেজ বা খৃস্টান মিশনারিদের হস্তক্ষেপ একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। বিশেষ করে সংস্কারে উৎসাহ দিতে ইংরেজ সরকারের আইন তৈরি করার তাঁর কাছে ভারতয় সমাজের উপর বিদেশী শাসকদের আক্রমণের সমতুল ছিল। তিনি দেশবাসীর রাজনৈতিক চেতনাকে উন্নত করে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং শিক্ষা প্রসারের হাতিয়ারের সাহায্যে সমাজকে গড়ে তোলার কথা বলতেন। "Indian problems must be solved by Indians"। তাঁর কথা ছিল "Education and not legislation is the proper method of eradicating the will"।

এজন্যই তিনি ইংরেজ সরকারের আনা Age of consent -এর তীব্র বিরোধিতা করেন।

১৮৯৬ সালে ভারতে সবচেয়ে বড় ও ব্যাপক ও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে আসে। এই দুর্ভিক্ষ মহারাষ্ট্রে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছিল। যুক্তপ্রদেশ (উত্তরপ্রদেশ), বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ ১,২৫,০০০ বর্গমাইল বর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১৮৭৮-৭৯ সালে দক্ষিণ ভারতের শুধুমাত্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতেই ৬০ লক্ষ লোক মারা যায়। (এই ৬০ লক্ষ তো সরকারি বয়ান, আসল সংখ্যাটা আরও বেশি)। ফলে গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিটন জেনারেল স্যার রিচার্ড স্ট্রাচীর নেতৃত্বে দুর্ভিক্ষ কমিশন গঠন করে। ১৮৮০ সালে কমিশনের প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারত সরকার fam-

ine code লাগু করে। এই কোড বা নিয়মাবলীতে দুর্ভিক্ষের সময় সরকারের অবশ্যকরণীয় কার্যাবলী ও দুর্ভিক্ষপীড়িত দুর্ভাগাদের সরকারি ত্রাণ দেওয়ার বিধিসমূহ নির্দেশিত হয়েছিল। তিলকের অনুগামীরা দুর্ভিক্ষে সরকারের করণীয় বিষয়গুলি জনসাধারণকে অবহিত করেন এবং সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী প্রচারপত্র ও পুস্তিকার মাধ্যমে সংকটাপন্ন মানুষদের মধ্যে বিলি করেন। তিলক এভাবেই মানুষকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে সরকারের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্য ত্রাণ ও সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিতে উদ্বুদ্ধ করেন। সরকারি খাজনা দেওয়ার জন্য নিজেদের জমি, গরু-বাছুর ইত্যাদি বিক্রি না করে ক্লীবতা পরিহার করে সবাইকে সাহসের সঙ্গে নিজেদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এবং প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিতে আহ্বান জানান। তিলক পত্রিকার মাধ্যমে আবেদন জানান—

".... when the Queen desires that none should die, when the Government diclares that all should live, will you kill yourself by timidity and starvation? If you have money to pay Government dues, pay them by all means. But if you have not, will you sell your things away only to avoid the supposed wroth of subordinate Government officers? Can you not be bold, even when in the grip of death?"।

দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ এভাবে তিলক বিদেশী শাসনে ক্লীবত্বপ্রাপ্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলার, 'বিধিদত্ত নিত্য অধিকার' প্রয়োগের জন্য উদ্যোগী করে তুলতে চেষ্টা করে গেছেন। খাদ্যের দাবিতে বাজার লুঠ করা, দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত হওয়াকে কঠোরভাবে তিরস্কার করে তিলক লিখেছেন, "Why loot the bazars? Go to the collector and tell him to give you work and food. That is his duty"।

তিলকের এই মহতী ভূমিকায় শাসক গোষ্ঠী হয়ে উঠেছিল আতঙ্কিত। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি চিহ্নিত হয়েছিলেন বৃটিশরাজের এক নম্বর শত্রু রূপে, আমলাতন্ত্রের চোখে মূর্তিমান বিভীষিকা। তাঁকে কি করে বিষবৃক্ষের ন্যায় সমূলে ধ্বংস করে ইংরেজ রাজত্বকে নিষ্কন্টক করা যায় এটাই হয়ে উঠল শাসক গোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা।

তিলক শুধু দুর্ভিক্ষপীড়িত জনতাকে তাদের ত্রাণ পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে ক্ষান্ত হননি, আপামর জনতার জন্য সংগঠিত করেছিলেন 'অন্নছত্র' ও সহায়তার বন্দোবস্ত।

ইংরেজ রাজত্বে দুর্ভিক্ষ কোনও অপরিচিত ঘটনা ছিল না। সহস্র অসম্মান ও অত্যাচার এবং অনাহার ও অর্ধাহার ছিল বিদেশী শাসকদের উপহার। "India must bleed for the enrichment and glorification of England"— এটাই ছিল তাদের ভারত শাসনের মূলমন্ত্র। ভারতীয়দের দুর্ভাগ্য, এবারে সবচেয়ে ব্যাপক এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না, দেখা দিল প্লেগ মহামারীর বিভীষিকা।

ইংরেজ সরকারের বয়ান অনুসারে ১৮৯৬ সালের মধ্যভাগ থেকে ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্লেগ মহামারীতে এক দশকেই মৃতের সংখ্যা ৫৪০,২২৫। এর মধ্যে প্রথম ১৮ মাসে মহারাষ্ট্রে প্লেগের বলি প্রায় দু'লক্ষ। সরকারি পরিসংখ্যান তো হিমশৈলের চূড়া মাত্র। Walter Strickland-এর কথায়— "in the last 10 years from 1896 to 1906, the English have allowed some 15 millions of inhabitants of India - that is good deal more than a twentieth of the whole population - to be sacrificed to plague and famine alone" (Indian Sociologist, London, Sept. 1912)।

শুধু কি দুর্ভিক্ষ বা প্লেগ! মৃত্যুর করাল গ্রাস, ব্যাধির যন্ত্রণা, অনাহার ও অর্ধাহার বৃটিশ শাসনের নিত্যপ্রাপ্তি। কিন্তু মারাঠাদের যে নির্যাতন, মনুষ্যত্ব ও ধর্মের অসম্মান, নারীর লাঞ্ছনা দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে হয়েছিল, তার তুলনা নিকৃষ্টতম নরকেও পাওয়া যায় না। ঝড়ের বেগে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ছে, দলে দলে দিশাহীন আতঙ্কিত মানুষ ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে একান্ত আপন স্বজনদের মৃত বা অর্ধমৃত দেহ ফেলে রেখে, নিরাপদ আশ্রয় থেকে অনিশ্চয়তার পথে। অথচ বিদেশী সরকার উদাসীন। কেশরী ও মারাঠা তো বটেই, অন্যান্য পত্র-পত্রিকাগুলিও এই মর্মন্তুদ কাহিনী পরিবেশন করে সরকারের সমালোচনায় মুখর, তবু সরকারের ঘুম ভাঙে না। দেশপ্রেমীরা দলে দলে প্লেগরোগীদের সেবায় নেমে পড়লেন। পার্সী সম্প্রদায়ের অভিজাত ও ধনীশ্রেষ্ঠ কামা পরিবারের বধূ, আসন্ন ভারতীয় বিপ্লবের জননী মাদাম কামা পরিবারের সমস্ত বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে সারাদিন রাত প্লেগ রোগীদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন। তিলক তাঁর অনুগামীদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন আর্তদের সেবায়। কিন্তু এদের শক্তি কতটুকু!

অবশেষে সরকার প্লেগ দমনে তৎপরতা দেখাতে শুরু করল। গঠন করল 'প্লেগ কমিশন'। সৈন্যবাহিনীকে কাজে লাগানো হয়। সাতারার অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর ওয়াল্টার চার্লস ব্যান্ডকে প্লেগ কমিশনার পদে বহাল করা হল। এই হৃদয়হীন ফিরিঙ্গী শাসকটির দাপটে সাতারার অধিবাসীদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। তিলক সেনা নামানো বা প্লেগ কমিশন গঠনে কোনও আপত্তি করেননি। কিন্তু দেখা গেল, ''কাতারে কাতারে মানুষ যখন মরছে, তখন তার উপর ছড়িয়ে পড়েছিল বিকট আমোদের হাসি— অশিক্ষিত গোরা সৈন্যদের হলদে দাঁত, বন্য মুখ থেকে।'' এই সৈন্যরা প্লেগ কমিশনের নির্ধারিত সমস্ত নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে হিন্দু গৃহস্থের রান্নাঘরে গিয়ে তাদের মুখের গ্রাসটুকুও

কেড়ে নিয়েছে, খাবার-দাবার নষ্ট করেছে, গৃহদেবতার বিগ্রহে থুতু ছিটিয়েছে বা সেগুলো ভেঙে তছনছ করে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে পৈশাচিক উল্লাসে।" গৃহস্থের সামান্য সঞ্চয় কেড়ে নিতে বা তৈজসপত্র আত্মসাৎ করতে তাদের কোনও লজ্জা হয়নি। প্লেগ রোগীর জামাকাপড় বা বিছানাপত্রের সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, বাক্সপ্যাঁটরা আগুনে জ্বালিয়ে তারা ধ্বংস করেছে পৈশাচিক উন্মত্ততায়। নারীর সম্মান ভুলুণ্ঠিত করতে বা তাদের শ্লীলতাহানি করতে নরপিশাচরা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়নি। প্লেগ তো শুধু প্রাণটুকু কেড়ে নেয়— অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন বা সম্মানহানি করে না। প্লেগ দমনের নামে তারা পুরুষদের প্রকাশ্য রাজপথে উলঙ্গ করে দাঁড় করাত এবং একই সঙ্গে মহিলাদের ঊর্ধাঙ্গ উন্মুক্ত করে নিম্নাঙ্গের বসন হাঁটুর ওপর তুলে দাঁড় করিয়ে রাখত বাহুসন্ধি ও কুঁচকির গ্রন্থি পরীক্ষা করার জন্য। মারাঠাদের চোখের সামনে তাদের সর্বস্ব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বুহ্যুৎসবে মত্ত পশুরা মহিলাদের বলাৎকার পর্যন্ত করেছে। সমস্ত পত্র-পত্রিকা প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে— আইন অমান্য করে এই নারকীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্লেগ কমিশনার র‍্যান্ডের কাছে আবেদনের পর আবেদন পাঠানো হয়েছে। কোনও ফল হয়নি, পরন্তু র‍্যান্ড জানিয়েছে শুধুমাত্র পর্দানশীন মহিলাদের ওভাবে পরীক্ষা করা যাবে না— হিন্দু মহিলারা পর্দানশীন নয়, সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিই বজায় থাকবে। একমাত্র মুসলমান মেয়েরাই পর্দানশীন। সেজন্য তাদের বেলায় অন্য আচরণ। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা র‍্যান্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সুবিচার চাইতে গেলে মিলেছে অপমান ও ধমক। তিলক এই নারকীয় অবস্থার প্রতিবাদে লিখলেন, "যারা শহরে রাজত্ব করছে, প্লেগও তাদের চাইতে ভাল।"

৪ মে, ১৮৯৭-এর কেশরী পত্রিকায় এক জ্বালাময়ী ভাষায় লেখা এক প্রবন্ধে তিলক অভিযোগ করেন যে, এই অত্যাচার শুধুমাত্র নিম্নপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের নয়, স্বয়ং সরকারের ইচ্ছাকৃত। ... যে সরকার স্বয়ং এই অত্যাচারের আদেশ দিয়েছে সেই সরকারের নিকট আবেদন করা বৃথা।"

প্লেগ মহামারীর জন্য শিবাজী উৎসব পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবারের উৎসবে অত্যাচারী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করার আহ্বান জানানো হল। শিবাজী উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত এক সবায় সভাপতিত্ব করেন তিলক। ঐ সভায় অধ্যাপক ভানু 'শিবাজী ও আফজল খাঁ' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। সভাপতির ভাষণে তিলক যা বলেছিলেন, ১৫ জুন ১৮৯৭ কেশরী পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়—

"আফজল খাঁর হত্যার বিষয়ে নতুন ঐতিহাসিক তথ্য

'ফিসচুলা, পাইলস্ থেকে বিনা রক্তপাতে চিরমুক্তি'

পায়ুদ্বারের ভেতরে বা বাইরের নানা শিরা উপশিরায় জ্বালাময়, যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিই হলো পাইলস্।

পায়ুদ্বারের পাশে হওয়া গর্ত থেকে পুঁজ, গ্যাস, রক্ত বা বায়ু ইত্যাদি নির্গত হলে তা হলো ফিসচুলা। এই সমস্ত রোগে রোগীরা এর ওর কথায় টোটকা ব্যবহার করেন। তাতে যন্ত্রণা বেড়েই চলে। ডাক্তারের কাছে গেলে উপদেশ দেন অপারেশনের। পুনঃ পুনঃ অপারেশনেও সারে না। কখনও কখনও সৃষ্টি হয় নতুন সমস্যা, অথচ আমাদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিনা অপারেশনে যন্ত্রণাহীন চিকিৎসার পথ খুঁজে পেয়েছে অনেককাল আগেই। আয়ুর্বেদে ক্ষারসূত্র ও কেমিক্যাল কর্টারির সুনিপুন মিশ্রণে **জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার** তৈরি করেছে এক অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি। যার সফলতম প্রয়োগে পাইলস এবং ফিসচুলার যন্ত্রণাহীন কার্যকরী চিকিৎসা করা সম্ভব। এই জাতীয় চিকিৎসায় নামমাত্র কাটা ছেঁড়ার প্রয়োজন হয়। তাই রোগী চিকিৎসার পর পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতে পারেন।

না এটা কোন হাতুড়ে অস্ত্রোপচার নয়, বিগত দশ বছর ধরে যে পদ্ধতিতে এখানে শত শত রোগী চিরতরে সুস্থ হয়েছেন সেই পদ্ধতি জাপানে তোয়ামা মেডিক্যাল কলেজ এবং নেপালে ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরীক্ষিত এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা (WHO) স্বীকৃত দিল্লীর AIIMS ও চণ্ডীগড়ের P.G.I. তেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

কি কি চিকিৎসা হয় এই পদ্ধতিতে?

প্রোলাপ্স পাইলস্, ফিসচুলা, ব্লিডিং পাইলস, পাইলোনিডাল সাইনাস, রেক্টোভ্যাজাইনাল ফিসচুলা, ফিসার সবকিছুরই চিরতরে মুক্তি ঘটে।

জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার

হাকিমপাড়া, হরেন মুখার্জী রোড, G.T.S. ক্লাবের নিকটে জর্জ ইনস্টিটিউট বিল্ডিং, শিলিগুড়ি

মোবাইল নং-9434877734

ঃ এখানে রোগীদের দেখার সময় ঃ

সোমবার থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২.৩০টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৫ টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।
ও শনিবার ঃ বিকেল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

সংগ্রহের প্রয়োজন নেই। একথা মেনে নিয়ে এগোনো যাক, শিবাজী পূর্বপরিকল্পনানুসারে তাকে হত্যা করেছিলেন। তার এই কাজ ভাল না মন্দ, সে ফয়সালা করার জন্য ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ধারা বা মনু-যাজ্ঞ্যবল্কের স্মৃতির সহায়তা নেওয়ার দরকার নেই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কোনও নীতি শাস্ত্রের দ্বারস্থ হওয়াও নিষ্প্রয়োজন। ... বিরাট মানুষরা শাস্ত্রবিধির ঊর্ধ্বে।... আফজল খাঁকে মেরে শিবাজী কি অন্যায় করেছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর মহাভারতে দেওয়া আছে। ভগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর আত্মীয়স্বজন, জ্যেষ্ঠদের পর্যন্ত মারতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ... শ্রীশিবাজী মহারাজ নিজস্বার্থে কিছু করেননি। জনকল্যাণের কথা ভেবে, ন্যায়ের জন্য তিনি আফজল খাঁকে মেরেছিলেন। বাড়িতে যদি কোনও চোর ঢোকে, আর তাকে তাড়াবার বাহুবল যদি না থাকে, তাহলে চোরকে অবশ্যই ঘরের মধ্যে বন্ধ করে পুড়িয়ে মারা যায়।... সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাম্রপট্টে খোদাই করে বিদেশীদের ভারত শাসনের অধিকার দেননি। মহারাজা শিবাজী বিদেশীদের নিজ মাতৃভূমি থেকে তাড়াতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া আর কোনও লোভের ব্যাপার তাঁর মধ্যে ছিল না।"

এই বক্তৃতা প্রকাশের সাতদিনের মধ্যেই ভারতের ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল একটি ঘটনার মাধ্যমে। ২২ জুন ১৮৯৭, ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেকের ৬০ বছর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে পুণায় সরকারি ভবনে উৎসব চলছিল। উৎসব থেকে ফেরার পথে দামোদর চাপেকর ও তাঁর ছোট ভাই বালকৃষ্ণ চাপেকর তাঁদের শিকার কুখ্যাত প্লেগ কমিশনার র‍্যান্ড ও লেফট্‌ন্যান্ট আয়ার্স্টকে গুলি করে হত্যা করেন। যে ভারত সরকার লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মৃত্যুতে সামান্যতম বিচলিত হয়নি, সেই সরকার পাগলা কুকুরের মতো ক্ষেপে উঠল দুই বিশ্বস্ত আমলার হত্যার প্রতিশোধ নিতে।

কেশরী ও পুণে বৈভব নিষিদ্ধ হলো। অনেকের সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হল বোম্বাই আইন সভার সদস্য তিলক (২৭.৭.১৮৯৭), সর্দার বালাসাহেব নাটু ও তারাসাহেব নাটুকে (২৮.৭.১৮৯৭)। তিলকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ প্রচার ও হত্যাকাণ্ডে উস্কানি দেওয়ার অপরাধে মামলা শুরু হল।

তিলক বাঙালীদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন। তাঁর এই বিপদে বাংলার প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তিলককে সহায়তা দেওয়ার জন্য কংগ্রেস সভাপতি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ৪০,০০০ টাকা সংগ্রহ করে বাংলার তিনজন কৃতি ব্যারিস্টারকে আইনী সাহায্য দেওয়ার জন্য বোম্বাই পাঠায় এবং তৎসঙ্গে ১৬,৭৬৮ আনা পাঠিয়ে দেয়।

বিচারপতি স্ট্রানী তিলককে ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। মামলায় নয়জন জুরী ছিল। তন্মধ্যে ৬ জন ফিরিঙ্গী ও তিনজন ভারতীয়। ফিরিঙ্গীরা একযোগে তিলককে দোষী সাব্যস্ত করে এবং ভারতীয় জুরীরা তাঁকে নির্দোষ ঘোষণা করেন।

তিলকের কারাদণ্ডের পর গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছিল— "Mr. Tilak though legally convicted, has been morally acquitted and has risen ten times higher in public estimation by the bold stand he took during the trial. It was an ennobling sight, when he was standing at the Bar and reiterating his innocence in spite of the verdict of the jury. A pure concience and fiseed resolution seemed to endow the man at the time with iron nerves and the people at once recognised in him a hero standing in defence of a national couse"।

তিলকের এই মহান ভূমিকা সারা দেশের জনমানসে অসাধারণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। তাঁকে কারারুদ্ধ করেও শিবাজী উৎসব বন্ধ করা যায়নি বরং তা দেশের সর্বত্র উদ্‌যাপিত হয়েছে মহাসমারোহে ও মর্যাদার সঙ্গে। বাংলায় ১৯০৩ সালে ১৭ জুলাই উদ্‌যাপিত শিবাজী উৎসবে সভাপতির ভাষণে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ''ইংরেজ যখন তিলককে লৌহ শৃঙ্খলে বেঁধে কারাগারে নিক্ষেপ করে, সেই সময় সাধারণ লোকে দেশের হিতব্রতী তিলকের শিরে স্বর্ণের রাজকিরীট পরিয়ে দিয়েছে।"

বোম্বাই আইনসভার সদস্য মহারাষ্ট্রের নবজাতীয়তাবাদের প্রবক্তা তিলক অনায়াসে ইংরেজ সরকারের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করে মুচলেকা দিয়ে রাজরোষ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারতেন। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের নবযুগের স্রষ্টা, নতুন পথের দিশারী তিলক তা করতে পারেননি, কারণ তিনি চেয়েছিলেন : আমার জীবনে লভিয়া জীবন, জাগরে সকল দেশ।"

সূত্র —

(১) G.P. Pradhan & A K Bhagwat - Lokmanya Tilak, Jaico Publishing House, Bombay, 1959. (২) শঙ্করীপ্রসাদ বসু। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ১ম, ৩য় ও পঞ্চম খণ্ড, মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৮১। (৩) হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ - কংগ্রেস (৩য় সংস্করণ), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ৭৩। (৪) সিডিসন কমিটি রিপোর্ট, ১৯১৮। (৫) R C Majumdar, History of Freedom Movement in India, Vol. I, Firma K L Mukhopadhyay, Calcutta, 1971.

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

“সেদিন আমরা একত্র হইনি—আজও নয়”

কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হইনি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয়নি। তারপর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি।

[*কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—‘স্বামী শ্রদ্ধানন্দ’ প্রবন্ধ—মাঘ ১৩৩৩*]

সৌজন্য : আশিস কুমার মণ্ডল

৩৩, গোরাচাঁদ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০০৬

HB ®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

ধামালি

চণ্ডী লাহিড়ী

কলকাতা থেকে বাসে শ্রীরামপুর যাচ্ছি, পথিমধ্যে একটি পানের দোকানের সাইনবোর্ড নজরে এল। দোকান মালিকের নাম ধামালি। বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের সামান্য পরিচয় আছে এদের এই টাইটেল দেখে অবাক হবার কথা নয়। কোটধামালি একটি পরিচিত শব্দ। আমাদের বাকপ্রণালীতে আছে—

— বেশি ধামালি করিসনে, সোজা ভাষায় কথাটা বল।

— দুটো টাকা চাই তোর— এর জন্য এত ধামালির দরকার নেই। শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে কীর্তন করতে গিয়ে ভক্তিরসের আতিশয্যে অতিরঞ্জিত করে যেসব কথা বলা হত, সেগুলি হল ধামালি। একটু আদিরস মিশিয়ে, কোন বয়সের সখীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কোন ধরনের লীলা করতেন, সেটা নেচে গেয়ে দেখাতেন কীর্তন শিল্পীরা। আদিরস ছিল সেদিন কীর্তনের মুখ্য উপাদান। ভালো করে গাইতে পারলে ভালো প্যালো পড়ার সম্ভাবনা।

কীর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক কথাই আজ টাইটেল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যদিও এখন কীর্তনের চাহিদা খুবই সীমাবদ্ধ। 'কীর্তনীয়া' টাইটেল তো আছেই। বন্ধুবর পল্লব কীর্তনীয়া নিশ্চয়ই কোন খ্যাতনামা কীর্তনীয়ার বংশধর। যারা একদা যাত্রা দল পরিচালনা করতেন, 'অধিকারী' টাইটেল তাঁদের কেউ কেউ বহন করছেন। যেসব পরিবার কথকতা করে জীবন ধারণ করতেন, তাঁদের অনেকেই পূর্বপুরুষের পেশা 'কথক' টাইটেলটি ব্যবহার করছেন। আমি নদীয়া জেলাতেই কয়েকঘর 'কথক' পেয়েছি। শ্রীখোল বাজানোয় দক্ষ যাঁরা ছিলেন তাঁরা বাদ্যকর টাইটেল নিয়ে বৈষ্ণব সমাজে টিকে আছেন। ঢাক ঢোল নয়, শ্রীখোল বাদনে দক্ষতা থাকলে তবেই 'বাদ্যকর' টাইটেল ব্যবহারের যোগ্যতা মেলে। সেখানে খুবই মান্য টাইটেল। মণিপুরের বৈষ্ণব মহলে শ্রীখোল বাদক পথেঘাটে প্রণাম পান।

আদিতে সব সমাজেই গ্রাম নামকেই টাইটেল হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পেশাগত টাইটেল এসেছে কিছু পরে। পাঞ্জাবীদের উপাধিতে গ্রাম নামের ব্যবহার খুব ব্যাপক। সুরজিৎ সিং মাজিঠিয়া নামের অন্তত পাঁচজন খুব বিখ্যাত। খান্না আর একটি বিখ্যাত গ্রাম। মেহেরচাঁদ খান্না ভারতের প্রথম উদ্বাস্তু মন্ত্রী। গ্রামের লোক নিজের নাম বাপের নামের পরই টাইটেল রূপে গ্রামের নাম বসিয়ে দেয়। এটা ভারতের সর্বত্র।

ইংরেজ সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবীদের প্রাধান্য খুব। সেখানে বরাবরই তাদের দাস মনোবৃত্তি খুব সক্রিয়। কর্নাইল সিং জার্নাইল সিং-এর চল খুব। কর্নেল সাহেবকে খুশি করার জন্য বাপ ছেলের নাম দিল কর্নাইল সিং বা জেনারেল সাহেবকে খুশি করার জন্য ছেলের নামকরণ হল জার্নাইল সিং।

সুবেদার সিং, রজমেন্ট সিং (রেজিমেন্ট), লটপট সিং (লেফটেন্যান্ট) সিং এসব তো আছেই। তবে আজও গ্রামের নাম টাইটেল হিসাবে বেশি জনপ্রিয়। লাঙ্গোয়াল, বেদী, তলোয়ার, বাদল সব টাইটেলই গ্রাম-নাম।

এই ব্যাপারটা অর্থাৎ গ্রাম নামকে ব্যবহারের প্রবণতা মহারাষ্ট্রেও ব্যাপক। তেণ্ডুলকর, সাভারকর, বেঙ্গসরকার, মঙ্গেশকর, আধারকার, গাভাসকর— সবই গ্রামের নাম। উপাধিধারীরা ওইসব গ্রাম থেকে উত্তরকালে বড় শহরে এসে নামযশ অর্থ উপার্জন করে বিখ্যাত হয়েছেন। কিন্তু এসব নিছক গ্রাম নাম। এর থেকে সামাজিক অবস্থান বা পেশার হদিশ পাওয়া যায় না। আলুওয়ালিয়ারা যেমন আসানসোলের আলু বিক্রেতা ছিল, সেটা পরে টাইটেল হয়েছে। নারিয়েলওয়ালা যেমন নারিকেল বেচে বড়লোক হয়েছে, সেরকম অনেক টাইটেল দেখে বোঝা দায় কিভাবে সেটা একটি পরিবারকে বেঁধে তার পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেসব পার্শি পরিবার কলকাতা থেকে

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা

ডাটা®

গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়

কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

বোম্বে গিয়েছিল, তাদের অনেকেই কলকাতাওয়ালা টাইটেল নিয়েছিল। পরে বোম্বে গিয়ে তাদের কেউ মদের দোকান দিয়ে দারুওয়ালা, বোতলের ব্যবসা করে বটলওয়ালা টাইটেল নিয়েছে। ক্রিকেটার ফারুক ইঞ্জিনিয়াররা তিনপুরুষ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে যুক্ত ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে আদালতকে কেন্দ্র করেই বহু টাইটেল বেঁচে আছে। উকিলের মুহুরি ছিলেন কেউ একজন— বংশানুক্রমে সেটাই টাইটেল। বিয়ের সময় জানা যায়, মুহুরিরা আসলে মুখার্জী বা ব্যানার্জী। গায়িকা রেবা মুহুরীর বাবা ডাঃ অমিয় সান্যাল। জজসাহেবের যিনি ম্যানেজার তাঁর নাম পেশকার। মোকদ্দমা আগে তাঁর কাছে পেশ করতে হয়। পেশকারের বাঁ হাতের রোজগার তো প্রবাদতুল্য। পেশকারের বাড়িতে মেয়ের বিয়ে দিয়ে অনেকেই ধন্য হয়। মুখতার এবং ভকিলও আজ টাইটেল। উকিলও আজ টাইটেল। যদিও আদিতে এটি পেশা। মতিলাল নেহরু ছিলেন ভকিল, ব্যারিস্টারের তুল্য পেশা।

ক্রোমোজোম নিয়ে সারা বিশ্বে এখন গবেষণা চলছে। লক্ষ্য রোগশূন্য পৃথিবী গড়ে তোলা। ভারতবর্ষে এ নিয়ে চেতনা গড়ে তোলা সাম্প্রদায়িকতায় উৎসাহ দেবার সমতুল্য। রক্ষণশীল সমাজে বারেন্দ্র-রাঢ়ি বা বারেন্দ্র-বৈদিক বিয়েতেই গেল গেল রব ওঠে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বা কায়স্থ পরিবারের সঙ্গে বিবাহ প্রায় অসম্ভব। প্রেমের বিয়ে হলে অবশ্য অন্য কথা।

এই যে ঘরে ঘরে ক্যানসার ছড়াচ্ছে, এর গভীরে আছে জিনের গোলমাল। একজনের হয়েছে, তার রক্তের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে সেই দূষিত জিন পর প্রজন্মেও প্রবাহিত এবং মৃত্যুর কারণ হবে। বিজ্ঞানীরা এখন বিশ্বাস করছেন, পূর্বপুরুষের বা নিকট আত্মীয় কারও ক্যানসার হয়ে থাকলে জিন গবেষণার মারফৎ তার সংশোধন সম্ভব। এটা তো এখন সবাই বুঝতে পারছে, ক্যান্সার এখন প্রায় পারিবারিক রোগ। বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তির রোগ নয়। বাবা থেকে ছেলে এবং নাতি প্রনাতিতে ছড়াচ্ছে। গোটা পরিবার ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়াচ্ছে। কাজেই যেখানে জিন নিজেই বিষাক্ত সেখানে সেই জিনের ধ্বংস ঘটিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায় কিনা সেটা জানা দরকার। জার্মান জাতের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী। এখন সেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিয়েতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। সেখানে ক্যান্সার কমেছে। প্রেমের বিয়ে সেদেশে বেশি জনপ্রিয় হওয়ায় নানা সংকর বর্ণের সৃষ্টি হচ্ছে, যাদের মধ্যে ক্যান্সার, হাইপ্রেসার এসব কম হচ্ছে। ভারতের মতো দেশে

যেখানে বংশ পরিচয়কে আজও সবকিছুর ঊর্ধ্বে রেখে বিয়ের ব্যাপারে এগোনো হয়, সেখানে ক্যান্সার, প্রেসার এসব থাকবেই। একমাত্র পথ প্রেমজ বিবাহ। আগামী দিনে ক্যান্সার হাই প্রেসার ইত্যাদি কমানোর জন্য যদি বাঙ্গালী বৈদ্যদের সঙ্গে ইউ পি-র বৈদ্যদের বা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিহারী ব্রাহ্মণদের বিয়ে জনপ্রিয় হতে দেখি অবাক হব না। যে আন্দোলনকে আজ সন্দেহের চোখে সমাজ দেখে, সামাজিক নিরাপত্তার জন্য কালই সেই আন্দোলন হয়ত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। থার্মোমিটারে পারদ থাকে, অতএব পারদ থেকে গায়ের জ্বর নিরূপণে কবিরাজ মশাইরা প্রবল বিরোধিতা করে শেষ পর্যন্ত হার মেনেছেন। বসন্তের টিকা গো-বসন্ত থেকে তৈরি হয় শুনে কেউ টিকা নিতে চাইতেন না। এখন সেই বিরোধিতা নেই।

Design's For Modern Living
Neycer
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
Sales Office : 15, College Street, Kolkata-700012
Ph : 2241-7149 / 8174, 2237-1521
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

PIONEER®
নিখুঁত লেখার খাতা
প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature..... কলাম।
PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net
PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

জোজিলা পাস— বরফাচ্ছাদিত উপত্যকা (বাস থেকে তোলা)।

সিন্ধু দর্শনে

বিজয় আঢ্য

সিন্ধু দর্শন উৎসবের কথা বেশ কয়েক বছর ধরেই শুনছি। কিন্তু শ্রীনগর জোজিলা পাস কারগিল পেরিয়ে লে-তে এই উৎসবে যাব— এমন ইচ্ছে মনে দানা বাঁধেনি। খরচের ব্যাপারটা যদি ছেড়েও দিই, সময় একটা বড় ফ্যাক্টর। জুন মাসের শেষ পনেরোটা দিন যাবেই। কেননা, উৎসবের দিন নির্দিষ্ট— ২৩ থেকে ২৫ জুন। কলকাতা থেকে আমাদের মতো আম-আদমির যাতায়াত নিয়ে পুরো ব্যাপারটায় পনেরো দিন লাগবেই। কাগজের কাজকম্ম সামলে এই সময় বের করাটাই এক দুরূহ ব্যাপার। তা কপালে বোধ হয় ছিল। মানিকদাকে বিষয়টা বলতেই এক কথায় রাজী। মানিকদা বরাবরই আমার ভ্রমণসঙ্গী। তাই প্রতিবারের মতো এবারেও ঝোলা কাঁধে বেরিয়ে পড়লাম।

জম্মু-তাওয়াই পৌঁছাল নির্দিষ্ট সময়েই। জম্মু স্টেশনের অদূরে বৈষ্ণব দেবী ধর্মশালাতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। মাথাপিছু ৬০ টাকার ডোর্মিটারি থেকে ১২০০ টাকার টু-বেডের রুম— এখানে সবই আছে। বারো শয্যার ডোর্মিটারিতে সিন্ধু যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা। দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ২৪০ জন যাত্রী এই যাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন। তার মধ্যে গুজরাটের সংখ্যাই বেশি। তবে দিল্লী থেকে আরও দু'শোজন যাত্রীও যাচ্ছেন— নিজেদের ব্যবস্থাপনায়। মনে হচ্ছে, একটা 'মিনি ভারত' চলেছে সিন্ধু দর্শনে। আমরা যে বাসের যাত্রী, সেই ৮ নং বাসে আমরা বাংলার দু'জন ছাড়া অসমের দু'জনও রয়েছেন। গুয়াহাটির নন্দদা আর সুভাষদা। দু'জনেরই পদবী— নাথ। এদের দু'জনকে ধরে পূর্ব ভারতের প্রতিনিধি আমরা চারজন। বাসে বাকি ভারতের আরও আটাশজন। তার মধ্যে কর্নাটকের চোদ্দ। যাত্রা শুরুর আগে উদ্যোক্তারা জম্মু, কাশ্মীর ও লাদাখ— এই তিন অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে সেখানকার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও যাত্রার সুবিধা-অসুবিধার কথা তুলে ধরে সকলের সহযোগিতা চাইলেন।

পরেরদিন সকালে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। আটটা বাসের কনভয় জম্মুর পাহাড়ী পথের চড়াই-উতরাই পেরিয়ে শ্রীনগরের দিকে এগিয়ে চলল। আমাদের বাসে সহযাত্রী কর্নাটকের বন্ধুরা সমবেত কণ্ঠে গান ধরেছেন। ভাষাটা বুঝতে না পারলেও ভাবটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি— দেশবন্দনার গান গাইছেন। জানলার ধারে বসার জায়গা পেয়েছি। যতদূর চোখ যায়, ততদূর প্রকৃতি তার মনোমুগ্ধকর অপরূপ শোভা বিস্তার করে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। নীচে— অনেক নীচে একটা পাহাড়ী নদী তীব্র বেগে বয়ে চলেছে। এটা কি সিন্ধু কিংবা সিন্ধুর কোনও শাখা? সিন্ধু আর কতদূর? ছোটবেলায় ইতিহাসে সিন্ধু সভ্যতার কথা পড়েছি। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ঋক্ বেদে,

আসেতুহিমাচলে উচ্চারিত স্নানমন্ত্রে, এদেশের প্রাচীন সভ্যতার পরিচিতিতে, হিন্দু-হিন্দুস্থান-ইন্ডিয়া নামের উৎসে, স্বাধীনোত্তর ভারতের জাতীয় স্তোত্রে যার উপস্থিতি, সেই সিন্ধুকে আমরা ক'জনই বা দেখেছি? ক'জনেরই বা সিন্ধুর পুণ্য সলিলে সিঞ্চিত হয়েছি, পেয়েছি গঙ্গা বা কাবেরীর মতো অবগাহন স্নানের সুযোগ? স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকর সিন্ধু নদীর জলে সিঞ্চিত হতে চেয়েছিলেন, তাঁর সেই সাধ আমরা পূর্ণ করতে পারিনি। সেই সিন্ধু দর্শনে আমরা চলেছি। সারা দেহ-মনে কেমন যেন একটা শিহরণ খেলে গেল।

লে— সিন্ধু নদীর তীরে নন্দদা ও সুভাষদার সঙ্গে লেখক।

বস্তুত বর্তমান ভারতবর্ষে ২৬০ কিলোমিটারের মতো দীর্ঘ পথ সিন্ধু অতিক্রম করলেও সেই স্থান অতি দুর্গম। ১৬ হাজার ফুট উঁচুতে দক্ষিণ পশ্চিম তিব্বতের মানস সরোবর থেকে উৎসারিত হয়ে হিমালয় পর্বতমালার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে লাদাখের লে-র কাছে বর্তমান ভারতের সীমারেখায় প্রবেশ করেছে। বাটালিকের পর সিন্ধুর দেখা মিলল। লাদাখের মানুষ সিন্ধুকে বলে দোধা। তারপর পাকিস্তানের পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশ হয়ে সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ২৯০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সিন্ধুর এই পথ পরিক্রমা সত্যিই বিস্ময় জাগায়।

বিশ্বের যেসব নদী ও তার উপত্যকা সভ্যতার বিবর্তনে, পোষণ ও উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সিন্ধু তার অন্যতম। গঙ্গা, সিন্ধু, নীল বা হোয়াং হো— এইসব নদী সংশ্লিষ্ট তটভূমিকে শুধু ধনধান্যে সমৃদ্ধই করেনি, বাণিজ্য বিস্তারেরও সুযোগ করে দিয়েছে। হাজার বছর ধরে সিন্ধু নদীর তীরে যে সভ্যতা বিবর্তিত হয়েছে, সেই প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার শক্তি ও সামর্থ্যের প্রতীক হলো সিন্ধু।

সংস্কৃত ভাষার 'সিন্ধু' শব্দটি থেকেই সিন্ধু নদীর নামকরণ। ঋক্‌বেদে সিন্ধুর প্রথম উল্লেখ দেখতে পাই। বেদে গঙ্গার মাত্র দু'বার উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সিন্ধুর হয়েছে কমপক্ষে তিরিশবার। ভারতীয় ইতিহাস ও ভূগোলে সিন্ধুর নামই প্রাচীনতম। ঋক্‌বেদে সিন্ধুর গর্জনকে ইন্দ্রের বজ্রের নির্ঘোষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বৈদিক যুগে সিন্ধুর বিস্তৃতি বোঝাতে সিন্ধু শব্দ সমুদ্রের সমার্থক হয়ে উঠেছিল। রামায়ণে সিন্ধুকে মহানদী বলা হয়েছে। মহাভারতে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গঙ্গা ও সরস্বতী নদীর পাশাপাশি সিন্ধুর নামও উচ্চারিত হয়েছে। আমাদের স্নানমন্ত্রেও গঙ্গা যমুনার পাশাপাশি সিন্ধুর নাম উচ্চারিত হয়েছে— 'নর্মদে সিন্ধু কাবেরী'...। কালিদাস, বান, ভাষ প্রমুখ সংস্কৃত কবি-মনীষীদের রচনাতেও সিন্ধুর প্রসঙ্গ এসেছে। এমনকী সিন্ধুর মাহাত্ম্যের কথা গ্রীক ও রোমান সাহিত্যেও বর্ণিত হয়েছে। আমাদের জাতীয় স্তোত্রেও সিন্ধুর উপস্থিতি— 'পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা'...।

প্রচলিত লোকগাথায় বলা হয়েছে ভগবান বুদ্ধ সিন্ধু তীরবর্তী এলাকায় এসেছিলেন। সেখানকার জলবায়ুর রুক্ষতা লক্ষ্য করে তিনি ভিক্ষুদের জুতা পরার অনুমতি দিয়েছিলেন। আজও সিন্ধু দেশে বহু প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপ দেখা যায়। আমাদের এখানে যেমন মঠ-মন্দির-আশ্রম, লাদাখের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তেমনই ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য গুম্ফা, স্তূপ, রঙ-বেরঙের পতাকার দীর্ঘ সারি। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রথমে সিন্ধু দেশ এবং পরে পাঞ্জাব জয় করে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কাশ্মীরের প্রাচীন রাজাদের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী'তে সিন্ধু ও সিন্ধুদের সম্বন্ধে বহু প্রসঙ্গ রয়েছে। এই সিন্ধুকে ভারতের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক রূপে তুলে ধরার জন্যই সিন্ধু দর্শন উৎসবের আয়োজন। সেইসঙ্গে ভারতের বীর সেনানীদের — যাঁরা দেশের এই প্রত্যন্ত দুর্গম হিমশীতল এলাকায় সীমান্ত রক্ষার কাজে জাগ্রত তাঁদের প্রতীকী অভিনন্দন জানানোও এই উৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষেরা এই উৎসবে তাই অংশগ্রহণ করুক— উৎসবের সূচনা পর্ব থেকেই উদ্যোক্তাদের এই আগ্রহ। তাঁদের সেই আগ্রহেই সাড়া দিয়ে আমরা চলেছি সিন্ধু দর্শনে। শ্রীনগর পৌঁছাতে রাত আটটা বেজে গেল। লালচকে প্রতাপ ধর্মশালায় যাত্রার বিরতি— রাত্রিবাস।

সকালে উঠে লালচক-টা এক চক্কর দিয়ে নিলাম। সংবাদ শিরোনামে মাঝেমধ্যেই লালচকের নাম উঠে আসে। লালচক শ্রীনগরের হৃদ্‌পিণ্ড— উপত্যকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পীঠস্থান। স্বাধীন ভারতে লালচক একটা চ্যালেঞ্জ। এখনও দেখলাম সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে নিরাপত্তা রক্ষীরা এলাকাটা ঘিরে আছে। তবে শুধু লালচক কেন, বস্তুত সারা উপত্যকাটাই সেনাবাহিনীর

নজরদারিতে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের চ্যালেঞ্জকে উপেক্ষা করে ১৯৯২-এর ২৬ জানুয়ারি ভারতের তেরঙা পতাকা তুলেছিলেন তৎকালীন বিজেপি সভাপতি ডঃ মুরলী মনোহর যোশী। সম্প্রতি সেই ট্রাডিশন অক্ষুণ্ণ রেখেছেন কয়েকজন বিজেপি কর্মী। সবার চোখে ধুলো দিয়ে তাঁরা প্রজাতন্ত্র দিবসে পৌঁছে গেছিলেন লালচকে। জাতীয় পতাকা ওড়াতে ওড়াতে হোটেল থেকে তাঁরা বেরিয়ে এসেছিলেন। গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন। কিন্তু সে তো অন্য প্রসঙ্গ, অন্য কথা।

শ্রীনগর থেকে কারগিলের পথ অতি ভয়াবহ। বিশেষত জোজিলা পাস। এই পথে প্রথমে পড়ে সোনমার্গ। প্রকৃতি যেন তার অফুরন্ত সৌন্দর্য এখানে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে। চারদিকে অত্যুচ্চ পর্বত ঘেরা এক বিশাল সমভূমি। সবুজে মোড়া। পর্বতের সানুদেশে ঘন সবুজের জঙ্গল। শীর্ষদেশগুলিতে বরফের মুকুট। সূর্যের আলোয় তা ঝকমক্ করছে। নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে সিন্ধুর হিমশীতল জলের খরস্রোতা এক শাখা নদী। ফেরার পথে এই নদীতেই স্নান করেছি। একটা ছোট বালতির জলে মানিকদা মাথায় ঢেলে দিতেই শক্ খাওয়ার মতো অবস্থা। যেটা অনুভব করেছিলাম গঙ্গোত্রী-গোমুখে। প্রকৃতির এই পটভূমিতে পাহাড়ের ঢালে লাল-নীল-হলুদ রঙের ছাদের ছোট ছোট বাড়ী— অনেকটা ছবির মতো মনে হচ্ছে। রাস্তার দু'পাশে একটা ছোট ঝক্মকে বাজার। সেখানে শীতের পোষাকই বেশি। কিছু লোক শীতের বস্ত্র নিয়ে ফেরিও করছে। দোকান ও ফেরিওয়ালাদের ঘিরে পর্যটকদের ভীড়। কেউ কেউ আবার ভাড়া করা ঘোড়ায় চেপে এলাকাটা ঘুরে দেখে নিচ্ছে।

সে যাই হোক, সোনমার্গকে পেছনে ফেলে বাস বালতালের দিকে এগোচ্ছে। আমাদের বাসের ইনচার্জ দিল্লীর বদরপুরের ডাক্তার সাহেব। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী আর পাঁচ বছরের নাতনী মুন্নি। খুবই কর্মতৎপর সেবাপরায়ণ। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ডাক্তার। একমাত্র পুত্রের অকাল বিয়োগের পর গভীর শোকাহত ডাক্তার দম্পতি সমাজের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছেন। ভাইপোর মেয়ে মুন্নি এখন তাঁদের চোখের মণি। মুন্নি ডাক্তার সাহেবকে পাপ্পা আর বহিনজীকে বলে মাম্মি। যদি কেউ তাকে পাপ্পার নাম জিজ্ঞেস করে, সে পাল্টা প্রশ্ন করে— কোন সা পাপ্পা? বড়া পাপ্পা না ছোটা পাপ্পা?

অমরনাথ যাত্রা তিনদিন পরেই শুরু হবে। বালতালে তারই প্রস্তুতি চলছে। বাস থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সবুজ চাদরে ঢাকা বিস্তীর্ণ সমতল এলাকা জুড়ে কয়েক হাজার ঘরবাড়ি। উপর থেকে সেগুলোকে খুবই ছোট দেখাচ্ছে। সব বাড়িগুলির টিনের ছাদে নানা রঙ— লাল, নীল, সবুজ। বহু ছোট বড় গাড়ি সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই বালতালেই অমরনাথযাত্রীদের স্থায়ী আবাস তৈরি নিয়ে জম্মুতে এক অভূতপূর্ব আন্দোলন হয়েছিল ২০০৮ সালে। সেই আন্দোলনে জম্মুতে পথে নেমেছিল স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে। ছোটরাও বাদ যায়নি। হিন্দুদের দাবীর কাছে ওমর সরকারকে, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মাথা নত করতে হয়েছিল। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বলেছিল, এই স্থায়ী আবাস তৈরি হলে উপত্যকার জনসংখ্যার ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটবে।

তিন-চারটে হেলিকপ্টার বালতাল থেকে অমরনাথে যাতায়াত করছে। দেখে মনে হচ্ছে, আকাশের বুকে লাল-নীল ফড়িং উড়ছে। বিমান থেকে নীচের শহরকে যেমন দেখায়, বাস থেকে সেরকমই দেখাচ্ছিল। হেলিকপ্টারের ভাড়া এখন অনেকটা সাধ্যের মধ্যে। হেলিকপ্টারে গেলে সময় কম লাগে, কষ্ট কম হয় ঠিক কথা। কিন্তু শিবের যে বিস্তৃত জটাজাল, তার অপরূপ শোভা দর্শন— শুধু চোখের দেখা নয়, মনে যে আনন্দের অনুভূতি তা থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়। ফেরার পথে কয়েকজন সহযাত্রী এই বালতালের পথেই অমরনাথে গেলেন। আমরা কয়েক বছর আগেই অমরনাথে তুষারলিঙ্গ শিবকে দর্শন করে এসেছি।

বালতালের পরই সেই অতি দুর্গম জোজিলা পাস। প্রায় ২০ কিলোমিটারের এক ভয়ঙ্কর পথ। যেদিকে তাকাই শুধুই বরফ। পাহাড়ের শীর্ষে বরফ, গায়ে বরফ, নীচে নদীর জল বরফ। দু'ধারে পর্বতগাত্র হয়ে উঠেছে বরফের দেওয়াল। সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এবড়ো- খেবড়ো সরু পথ। বাস ধীরে, অতি ধীরে এগুচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১১ হাজার ফুট উঁচু। একদিকে অত্যুচ্চ পাহাড়, আরেক দিকে অতল খাদ। একটু এদিক-ওদিক হলেই ভবলীলা সাঙ্গ হবে।

জোজিলা পাস পেরোতে ঘন্টা দেড়েক লেগে গেল। দ্রাস হয়ে কারগিলে পৌঁছাতে রাত ন'টা বাজল। নামে কারগিল যুদ্ধ হলেও আসল যুদ্ধটা হয়েছিল দ্রাস-এ। তবে জেলার নাম কারগিল, সেইজন্য এই নামেরই প্রসিদ্ধি। দ্রাসে রয়েছে সেনাবাহিনীর একটি মিউজিয়াম। কারগিল যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে এই মিউজিয়াম— হল অফ ফেম। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকে। আমাদের জন্য অবশ্য বিশেষ অনুমতি ছিল। দেরি হলেও বিশেষ অসুবিধা হয়নি। একজন সেনা অফিসার কারগিল যুদ্ধের কথা, জওয়ানদের মরণপণ যুদ্ধের কথা আমাদের শোনালেন। পাহাড়ের ওপারেই পাকিস্তান। পাহাড়ের এপার থেকে— যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার কয়েক কিলোমিটারের মধ্য থেকেই শত্রু পক্ষের দিকে কামান দাগা হোত। যুদ্ধের স্মৃতি হিসাবে কয়েকটি কামানও প্রদর্শনের জন্য রাখা আছে। মিউজিয়াম কক্ষে সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে ভারতীয় সেনাদের বীরত্বের নানারকম ছবি— নীচে ক্যাপসান, বিভিন্ন রকমের অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধে ব্যবহৃত নানা সরঞ্জাম। ১৯৪৭ সালে জেনারেল কারিয়াপ্পা এখানে এসেছিলেন— সেই ছবি। মিউজিয়ামের বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মাঝে একটা ছোট উদ্যানে শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে জ্বলছে অনির্বাণ জ্যোতি। জওয়ানদের পক্ষ থেকে আমাদের সব যাত্রীকে চা দিয়ে আপ্যায়ন করা হলো। জওয়ানদের সঙ্গে কেউ কেউ ছবিও তুললেন।

২২ জুনের ভোরে কারগিল থেকে লে-র উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। কারগিল থেকে লে-র দূরত্ব ২২৯ কিলোমিটার। শ্রীনগর থেকে ৪৩৪ কিমি। মানালি থেকেও লে যাওয়া যায়। সে পথের দূরত্ব ৪৭৩ কিলোমিটার। এ পথটি তুলনামূলকভাবে বেশি দুর্গম। দ্রাসের পর সবুজের চিহ্ন প্রায় নেই। রুক্ষ মাটির পাহাড়। ড্রাই ডেসার্ট। সূর্যের আলো পড়ে যে আলো-ছায়া সৃষ্টি হয়েছে তাতে পাহাড়ের রঙ কখনও সবুজ, কখনও লাল, কখনও বা ধূসর। এক এক সময় মনে হচ্ছে যেন বালির স্তূপ। যেটুকু সবুজ আছে, সেখানে পাহাড়ের উপরই চরে বেড়াচ্ছে ভেড়ার দল। ছাগলও আছে। গোরু নেই এমন নয়, তবে কম। গোরুদের রঙ কালো।

পথে পড়ে মূলবেক। এখানে রয়েছে গুম্ফার গাত্রে ২০০০ বছরের প্রাচীন ৯ মিটার উঁচু সুবিশাল বুদ্ধমূর্তি। অনেকটা কর্নাটকের শ্রবণবেলগোলার জৈন মহাবীরের মূর্তির মতো। নীচে গুম্ফার কক্ষে রয়েছে বুদ্ধদেবের পূর্ব ও আগামী জন্মের প্রতিকৃতি। প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রের গ্রন্থাগার। এক অতি বৃদ্ধা লাদাখি-কে দেখলাম। লাঠি হাতে চলেছেন ধর্মচক্র-র দিকে। মা আসার সময় কিছু টাকা দিয়ে বলেছিল, পুজো দিবি। সেই বৃদ্ধা মা-কেই তা দিলাম।

ঘন্টাখানেক চলার পর বাস থামল পাথর সাহেব গুরুদ্বারায়। গুরু নানকদেব এখানে তপস্যার জন্য এসেছিলেন। প্রচলিত লোকগাথা এই— রাশি নামে এক দুর্বৃত্ত তাঁর তপস্যা ভঙ্গের জন্য পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল। সেই পাথর এখনও রক্ষিত আছে। রাশি পরে তার নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিল। অনুতপ্ত রাশিকে গুরু মানবসেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করতে বলেছিলেন। শিখগুরুদের স্মৃতিবিজড়িত এমন স্থান ছড়িয়ে আছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে। যেমন বদ্রীনাথের পথে হেমকুণ্ডে। গোবিন্দঘাট থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার পথ। বিশ্বাস— এখানে গুরু গোবিন্দ সিংহ পূর্বজন্মে মেধা ঋষি রূপে তপস্যা করেছিলেন। সেখান যেদিন পৌঁছেছিলাম, সেদিন বিজয়া দশমী। গুরু পূজার শেষ দিন। সব কিছু গুটিয়ে নিয়ে ফেরার পালা। তাই সব কিছুই গুরুর প্রসাদ হিসাবে বিলানো হচ্ছিল। একটি চাদর ও ব্রহ্মকমল পেয়েছিলাম। জম্মু স্টেশনে পাশে বসা এক শিখ বন্ধুকে আলাপ-পরিচয়ের সুবাদে একথা জানালে তিনি তারিফ করে বললেন— ইউ আর এ লাকি ম্যান। চাদরটা এনে মাকে দিয়েছিলাম। মা তা ঠাকুরঘরে রেখে দিয়েছেন। পাশেই ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার— স্বর্গের নন্দনকানন। আগষ্ট থেকে অক্টোবর— পুরো উপত্যকা জুড়ে নানা বিচিত্র বর্ণ গন্ধের অজস্র ফুলের মেলা। ব্রহ্মকমল এখানেই ফোটে। নন্দনকাননে বিচরণের সুযোগ হয়নি। কেননা তখন সময় নয়। একজন ফটোগ্রাফার ফুলের একটা অ্যালবাম দেখিয়েছিল। কিন্তু বিক্রি করতে রাজি হয়নি।

মুকবের— ধর্মচক্রের সামনে এক লাদাখি মা-এর সঙ্গে লেখক।

লে-তে যখন পৌঁছালাম তখন রাত ন'টা বেজে গেছে। এখানে সন্ধ্যে হয় সাড়ে আটটা নাগাদ। সিন্ধু নদীর তীরে লে লাদাখের সদর শহর। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৫০৫ মিটার উঁচু। অত উঁচুতে হলেও শহরটা বেশ সাজানো-গোছানো। আধুনিক জীবনের সুযোগ-সুবিধা এখানে পাওয়া যায়। শহরের পোলো গ্রাউন্ড থেকে শান্তিস্তূপের মাঝে গড়ে উঠেছে বাজার, হোটেল, রেস্তোরাঁ, ক্যাফেটোরিয়া, সাইবার কাফে, ম্যাসাজ পার্লার, ভিডিও পার্লার, বিদেশী সাজসরঞ্জামের দোকান, জামাকাপড়ের দোকান, শুকনো ফলের দোকান, কিউরিও শপ— সব মিলিয়ে লে এক জমজমাট শহর। শীতের মাস ক'টা বাদ দিলে— মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যটকদের ভীড় লেগেই থাকে। দোকানগুলোতে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের ভীড়ও দেখলাম। আমাদের সহযাত্রীদেরও অনেকেই কেনাকাটা করছেন। মানিকদা কিছু আপেল শুকনো আর খোমেনি (স্থানীয় ফল) নিয়ে এলেন। লাদাখ কথাটির অর্থ গিরিবর্ত্মের —পাহাড়ী পথের দেশ। উত্তরে কারাকোরাম আর দক্ষিণে হিমালয় লাদাখকে ঘিরে রয়েছে। ভারতবর্ষে একমাত্র লাদাখেই হিমালয়কে দক্ষিণ দিকে দেখা যায়। লাদাখের বেশিভাগ অংশই রুক্ষ। এখানে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। তবে আমরা যখন লে-তে ছিলাম তখন একদিন সন্ধ্যের দিকে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছিল। নিজেদের মধ্যে মজা করে বলছিলাম, পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। তবুও যে এখানে মাঝেমধ্যে সবুজ ফসলের ক্ষেত চোখে পড়ছে, তা তুষার গলা জলের ফলে। সেই জলকে সেচের কাজে লাগিয়ে সবুজায়নের চেষ্টা চলছে। লাদাখের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হলো— গ্রীষ্মে তাপমাত্রা উঠে যায় ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস অবধি, শীতে আবার কোথাও কোথাও নেমে যায় মাইনাস ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দিনের বেলায় বেশ গরম লাগবে, রাতে গায়ে লেপ দিতে হবে।

বহুদিন ধরে লাদাখের অধিবাসীরা একঘরে ছিলেন। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে প্রায় কোনও যোগাযোগই ছিল না। কিছু সরকারি চাকুরিজীবী আর লাদাখ নিয়ে গবেষণা করতে আসা কিছু বিদেশী ছাড়া এখানে বড় একটা কেউ আসতো না। ১৯৭৪ সালের পর রাস্তাঘাটের সামান্য উন্নতি হলে কিছু কিছু পর্যটক আসতে শুরু করেন। এখন পর্যটকদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। প্রায় ন'মাস রাস্তা খোলা থাকে। লাদাখ জম্মু-কাশ্মীর

রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও এই অঞ্চলের সিকিউরিটি বা নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব রয়েছে আর্মির কোর কম্যান্ডার-এর উপর। ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশের (আই টি বি পি) মূল কেন্দ্র এই লাদাখেই। প্রশাসনের কাজের সুবিধার জন্য লাদাখকে দুটি জেলায় ভাগ করা হয়েছে— লাদাখ ও কারগিল। লাদাখের একাংশ লাহুল ও স্পিতি-কে হিমাচল প্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। লাদাখের জনসংখ্যা তিন লক্ষ। লাদাখ জেলার ৮৫ শতাংশ মানুষই বৌদ্ধ, বাকি ১৫ শতাংশ মুসলিম। কারগিলে এটা আবার সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানকার বেশিরভাগ মানুষই— ৬০ শতাংশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করে। ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ সরকারি কাজের সঙ্গে যুক্ত। বাইরের কেউ এখানে এসে সরকারি চাকরি পাবে না, জমি কিনতেও পারবে না। কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের চেষ্টা চলছে। বাকিরা মূলত চাষবাস করে থাকে। জোয়ার আর গম প্রধান ফসল। চাপাটি বা রুটিই প্রধান খাদ্য।

প্যাঙ্গন লেক

লাদাখের সংস্কৃতি মূলত তিব্বতী সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। ১৮৩৪ সালে রাজা তন্ডুকা নামগিয়াল পর্যন্ত লাদাখ স্বাধীন ছিল। তারপর রাজা গোলাপ সিংয়ের আমলে জম্মু-কাশ্মীরের সঙ্গে যুক্ত হয়। লাদাখিরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ভগবান বুদ্ধের বহু রূপের উপাসক। হিন্দুদের মতো বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসী। কর্মফল ও পুনর্জন্মবাদ মানে। চেহারা, পোষাক, খাদ্যাভাস, সামাজিক জীবন, পূজা-পার্বণ সবই তিব্বতীদের মতো। তিব্বতের লাসার বিখ্যাত পোটালা প্রাসাদটি এখানকার লে প্রাসাদের অনুকরণেই তৈরি। লে প্রাসাদ পোটালা প্রাসাদের প্রায় ৫০ বছর আগের তৈরি। এরা ধর্মপ্রিয়। হিংসায় বিশ্বাস করে না। তবে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এরা ক্যারাটে বা যুযুৎসু-তে পটু। এদের নৃত্য-গীত-বাদ্যে সেই শৌর্যবীর্যের প্রকাশও লক্ষ্য করা যায়। লাদাখের চোগলামসাল-এ রয়েছে বৌদ্ধ শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র। রয়েছে অসংখ্য গুম্ফা, শান্তিস্তূপ।

লাদাখে এক সময় প্রতি পরিবার থেকে একজন লামা (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু জনভারসাম্য বিচ্যুতি হওয়ার আশংকায় স্বয়ং দলাই লামার নির্দেশে এখন এই প্রথা আর বাধ্যতামূলক নেই। তবে ইচ্ছে হলে যে কেউ লামা হতে পারে। এখানে প্রতি শতাংশে দুই-তিনজন নারীর সংখ্যা বেশি। লাদাখি সমাজে দহেজ বা পণ প্রথা নেই। বরং উল্টো— কন্যাপক্ষকে পণ দিতে হতে পারে। এছাড়া আগে যে 'দুই ভাই, এক বিবি' প্রথা চালু ছিল আজ আর তা নেই। এরা অতিথি-পরায়ণ। শান্ত নির্বিরোধী সরল এদের জীবন।

শিক্ষা বা লেখাপড়ার দিক থেকে এরা এখনও পিছিয়ে আছে। ছেলেমেয়েরা স্কুলে গেলেও ড্রপ আউটের সংখ্যা বেশি। এনিয়ে একজন স্থানীয় শিক্ষিত লোক বললেন, এখানকার বাতাসে অক্সিজেনের ভাগ কম— নাইট্রোজেন বেশি। ফলে মস্তিষ্কের উপর এর প্রভাব পড়ে। তাই শিক্ষায় তেমন উন্নত নয়। সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শাখা লে-এর কাছে খোলা হয়েছে।

যে জন্য এই যাওয়া, সেই সিন্ধু দর্শন উৎসব হলো ২৪ জুনের সকালে— সিন্ধু নদীর তীরে। লে-র সিন্ধু ঘাটে। পনেরো বছর আগে— ১৯৯৭ সালে এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন এন ডি এ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল কে আদবানী। তা সে যাই হোক, অনেক সহযাত্রীকেই স্নান করে পূজাপাঠ, দান-ধ্যান করতে দেখলাম। সব মিলিয়ে প্রায় ৫০০০ মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। উৎসব চলেছিল প্রায় ঘন্টা তিনেক। বিশাল এলাকা জুড়ে জমজমাট সেই উৎসবে স্থানীয় মানুষের বিভিন্ন গোষ্ঠী নৃত্য-গীত আর বাদ্যের মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরলেন। বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যে এই বার্তাই দেওয়া হলো— জাতীয় সংহতির স্বার্থেই এই উৎসব। জম্মু, কাশ্মীর উপত্যকা এবং লাদাখ— এই তিনটি ক্ষেত্রের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরম্পরার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকলেও জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষায় সর্বদা সচেতন। এই তিন ক্ষেত্রের সীমান্তেই পাকিস্তান ও চীন ওঁৎ পেতে বসে আছে। সুযোগ পেলেই সৌজন্যের মুখোশ খুলে ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই দেশের মূল সমাজের সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি অত্যন্ত প্রয়োজন। সিন্ধু দর্শন উৎসব যে সেই ভাবনাকে পুষ্ট করছে— এখানে সেই অনুভবটাই বড় পাওনা। বিশেষত উৎসবের শেষ লগ্নে সহভোজ

SATYANARAYAN ACADEMY

(A Registered Society Under West Bengal Society Registration Act, XXVI, 1961)
N.G.O. Registration No. S/78361 of 94-95

(An Organisation for Development of Education, Integrated Rural Welfare and Development of Society)

Village - Ramkrishna Nagar, Shibrampur, P.O.- Narrah, P.S.& Dist Bankura -722155, W.B., India

School Campus : Ramakrishna Nagar, Shibarampur, Narrah, Bankura – 722 155 Phone (03242) 264265/ 264252
Registered Office : 7B Kiron Shankar Ray Road, 4th Floor , Kolkata – 700 001.Phone (033) 22301872 / 22437385
Branch Office : Baisakhi Bhavan, Machantola, Bankura – 722 101, Phone -(03242)250348/240653
Website: www.satyanarayanacademy.com, e-mail: sn_datta@yahoo.com, Mobile : 9434003971 / 973263785,

Affix a recent Passport Size Photograph with cross signature in Black Pen

Donate $250 and be LIFE MEMBER

Affix a recent Passport Size Photograph with cross signature in Black Pen

Life Membership Form for Couple

1. Name of the Member : .....
2. Spouse's Name : .....
3. Date of Birth of the Member : Husband ..... Wife .....
4. Children's Names and Date of Birth with address and Photograph with details in separate sheets to be attached :
4. Address : .....

   .....

   e-mail ..... Phone No.....
5. Qualifications : Husband .....

   Wife .....
6. Details of yearly earning by employment / profession and mention in details :-

   Husband : .....

   Wife : .....
7. Address of India : .....

   .....
8. Parent's name of the Member and Spouse in details with address.

   .....

   .....

   .....

Remit money as Donation to our FCRA No. 147120838 (Educational) United Bank of India Account No C/A11918 High Court Branch, B.B.D Bag . Kolkata – 700 001, W.B. India.

Date : Signature (Husband) Signature (Wife)

Invitation and Golden Opportunities to Visit Mother 'Saradamayee's , Thakur – 'Sree Ramakrishna Dev' and Swami 'Vivekananda's Land'

HURRY UP ! LIMITED SEATS - FIRST COME FIRST SERVE BASIS

Country People, Non-resident Indians (NRIs) and Foreigners can avail the privilege to stay in the 'Rural Bengal'(Sonar Bangla) for a period of 7 (seven) days in a year by becoming a **Life Member**.

You can accept our hospitality in our Guest House situated in the rural pollution free atmosphere amidst the small and young children.

- ***Life Membership Fees is only Rs. 10,000/- or $250 for couples. Children will be charged separately***
- ***All other facilities for Tour all-over India are available with responsibilities and in accordance with your programme.***
- ***Donations are accepted on satisfaction of our services.***

Our F.C.R.A. A/C No. C/A 11918, United Bank of India, High Court Branch, Kolkata-1

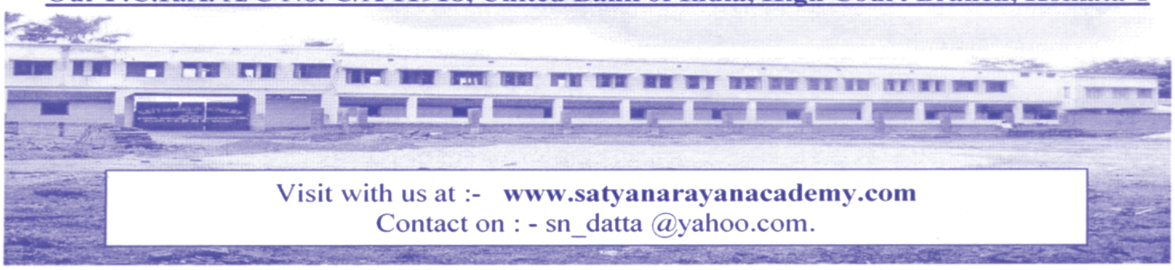

Visit with us at :- **www.satyanarayanacademy.com**
Contact on : - sn_datta @yahoo.com.

ছিল একাত্মতার এক অনন্য অনুভূতি।

কিন্তু সিন্ধু নদীতে স্নান করতে গিয়ে এক বিপত্তি ঘটল। সিন্ধু নদীতে জল বেশি নেই— এক কোমর হবে। তবে খরস্রোতা, ঠাণ্ডাও। কোনওরকমে তিনটে ডুব দিয়ে স্নান সারলাম। পাড়ে উঠে দেখি পায়ের তলা থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। নদীর জলের তলায় কাঁচের টুকরো ছিল। তাতেই পায়ের তলাটা কেটে গেছে। জীবনে এই প্রথম শরীর থেকে এত রক্ত বেরুতে দেখলাম। একটু ভয় পেয়েও গেলাম। কিন্তু সহযাত্রীদের সহযোগিতা ও ব্যবস্থাপকদের তৎপরতায় সেই ভয় কাটতে বেশি দেরী হয়নি। মহারাষ্ট্রের এক বহিনজী নিজের মাফলার দু-তিনবার ভিজিয়ে এনে কাটা জায়গাটার ওপর চেপে ধরলেন— রক্ত যাতে বন্ধ হয়। আরেকজন সহযাত্রীরও আমার মতো অবস্থা। মুকেশ দাভে। গুজরাটের সুরাট থেকে এসেছেন। বিল্ডিং কন্ট্রাক্টর। জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশের গাড়িতেই আমাদের দু'জনকে লে-র এমারজেন্সি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। দু'জনেরই পায়ে সেলাই হলো। ব্যান্ডেজ বাঁধা পা নিয়ে পুলিশের গাড়িতেই আবার ফিরে এলাম। বসে বসে উৎসবও দেখলাম।

ইতিমধ্যে অনেকেই এসে পায়ের খবর নিলেন। দাদা কৈসা হ্যায়— কতজনই যে জিজ্ঞেস করলেন। ইন্দ্রেশজীও এসেছিলেন। তিনি এই উৎসবের অন্যতম উদ্যোক্তা। এদের সহমর্মিতায় অজান্তেই চোখে জল এসে গিয়েছিল। মানিকদা যখন ইন্দ্রেশজীকে বললেন, সিন্ধু মা রক্ত চাইছিলেন। বিজয়দার কাছ থেকে সেই রক্ত নিলেন। ইন্দ্রেশজী একটু হেসে বললেন, ইয়ে বাত সহী হ্যায়। কাশ্মীর রক্ষা কে লিয়ে বাঙ্গাল কা ডঃ শ্যামাপ্রসাদজী পহেলা রক্ত দিয়া। ইন্দ্রেশজী যাই বলুন না কেন, এই শরীরের রক্তটা যে বদ-রক্ত, সিন্ধু জননীর তা যে কোনও কাজেই লাগবে না, সে ব্যাপারে সেন্ট পার্সেন্ট নিশ্চিত। তবে ডাক্তার সাহেবের কথা ভুলবো না। তিনি রোজ রাতে ক্ষতস্থানটা ড্রেসিং করে দিতেন।

সিন্ধু উৎসব দেখে ফেরার পথে আমাদের থিকসে গুম্ফা আর শান্তিস্তূপ দেখতে নিয়ে যাওয়া হলো। চারজনে বসার ফোর হুইলার। সহযাত্রী সুরাটের পীযূষজী ও তাঁর স্ত্রী। পুণার এক বহিনজী আর আমি। শান্তিস্তূপ থেকে লে শহরটাকে ছবির মতো দেখায়।

লে পৌঁছানোর পরের দিনই প্যাঙ্গন লেক ঘুরে এসেছিলাম। লে থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে প্যাঙ্গন লেক। তিব্বতি ভাষায় প্যাঙ্গন সো। সো মানে সরোবর। লে থেকে একটা ছোট গাড়ীতে আমরা চারজনের একটা টিম রওনা দিলাম। যাওয়ার আগে বিদ্যাভারতীর সরস্বতী শিশু মন্দিরে যে স্কুলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল, তার প্রধান আচার্য বিজয়জীর বাড়িতে ছিল চায়ের আমন্ত্রণ। বহিনজীর আন্তরিক আপ্যায়ন মনে থাকবে। তিনিও স্কুলের আচার্যা। স্কুলের ছাত্রাবাসের দেখভালও করেন।

লে-মানালি রাস্তা ধরে কারু। এখানেই জলযোগ সেরে নিতে হলো, কেননা, এরপর আর কোনও জনপদ নেই। কারু থেকেই বাঁদিকে চলে গেছে প্যাঙ্গন-এর রাস্তা। পুরো রাস্তাটাই রুক্ষ মাটির পাহাড়। গাড়োয়াল বা কুমায়ুন হিমালয়ের ঘন সবুজ রূপ এখানে নেই। পাহাড়ের চূড়োগুলোতে জমাট বরফ। রোদের আলোয় সেগুলো ঝলমল করছে। মাঝে মাঝে কিছু সমতল এলাকা। সেখানে অবশ্য চাষ হচ্ছে — বরফ গলা জলে। বৃষ্টি হয় না বটে, কিন্তু জলের কোনও অভাব নেই। সেই জলকেই সেচের কাজে লাগানা হচ্ছে। চাষের জমি লাগোয়া দূরে দূরে কয়েকটা ঘর। লোকজন খুব কম। তাদের এক-দুজন ছাগল বা ভেড়া চরাচ্ছে। ঘোড়ার একটা দলকে নিয়ে দু-চারজনকে যেতে দেখলাম।

প্যাঙ্গন যাওয়ার পথে পড়ে চাংলা। ১৭৫০০ ফুট উঁচু। বাতাসে অক্সিজেন বেশ কম। একটা অস্বস্তির ভাব। তবে এই তুষার রাজ্যে পা রাখার আনন্দে তা পাত্তা দিলাম না। যেদিকে চোখ যায়, যতদূর যায়— শুধুই বরফ আর বরফ। এমন বরফের রাজ্য এর আগে কখনও দেখিনি। কতকগুলো ছেলে বরফের উপর লাফালাফি করছে। ছবি নিলাম। বেশ কয়েকটা ছবি তুললাম— কিছুতেই যেন তৃপ্তি হচ্ছিল না। পাসের উপর চাংলাবাবার মন্দির। পাশেই একটা মিলিটারি ক্যান্টিন রয়েছে। চা খাওয়া গেল। একজন জাপানী মহিলার সঙ্গে পরিচয় হলো। তাঁরা এসেছেন বৌদ্ধ তীর্থস্থান দর্শনে। এই দুর্গম পথে একজন বিদেশীকে সাইকেল চালিয়ে যেতে দেখে একটু অবাকও হলাম।

চাংলা থেকে রাস্তা এঁকেবেঁকে চলেছে। চারদিকে বাদামি, মরচে রঙা পাহাড়। মাথার উপরে নীল আকাশ। এমন ঘন নীল আকাশ খুব কমই চোখে পড়ে। এই তীব্র নীল আকাশের চাঁদেয়া লাদাখের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এসব দেখতে দেখতেই দুপুর একটা নাগাদ প্যাঙ্গন পৌঁছালাম। ১৪ হাজার ফুট উঁচুতে প্যাঙ্গন-এর এই লেক দৈর্ঘ্যে ১৩০ কিলোমিটার। লেকের ৯০ কিলোমিটার আছে চীনের দখলে। বাকি ৪০ কিলোমিটার ভারতের। চওড়ায় এই সরোবর কোথাও ২-৩ কিলোমিটার, কোথাও বা ৫-৬ কিলোমিটার। চ্যাংচেনমো পর্বতশ্রেণী দিয়ে ঘেরা এই লেক এশিয়ার সবচেয়ে বড় নোনাজলের লেক। লেকের জলের রঙের বৈচিত্র্য নজর কাড়ে। কোথাও নীল, কোথাও গাঢ় নীল, কোথাও বা সবুজের আভা। হাওয়ায় ছোট বড় ঢেউ উঠছে। লেকের ঘেঁসা পথ চলে গেছে আরও সাত কিলোমিটার— সপাংমিক গ্রাম অবধি। এই পর্যন্ত পর্যটকদের যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। আমরা অবশ্য বেশী দূর যাইনি। আমাদের দিকে লেক যেখানটা শুরু হয়েছে তার কিছু দূরে গাড়ি দাঁড়াল। ঘন্টাদুয়েক ছিলাম। লেকের জল স্পর্শ করলাম। তীব্র হিমশীতল তুষার গলা জল। লেককে পেছনে রেখে বেশ কয়েকটা ছবিও তুললাম। সত্যিই নয়নাভিরাম দৃশ্য। যতদূর দৃষ্টি যায়, পাহাড়কে পাশে রেখে শুধু নীল জল। বেশ কিছু পাখি লেকের জলে ভেসে বেড়াচ্ছে। আমাদের গাড়ির ড্রাইভার সুকর্মা বয়সে যুবক। গাড়িতেই পরিচয়-আলাপ হয়েছে। সে লেকের জলের একটু মুড়ি ছুঁড়ে দিতেই হই হই করে পাখির দল উড়ে

এল। দৃশ্যটা ক্যামেরা বন্দী করতে দেরি করিনি। দারুণ লাগল।

লেকের ধারে কয়েকটা ছোট ছোট হোটেল। সবই অস্থায়ী। এরই একটাতে চা খেলাম। মুম্বাই থেকে আসা একটা পরিবারের ছোট্ট মেয়ে পদ্মা হোটেলটা দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। ওর সঙ্গে একটু মজা করা গেল। প্যাঙ্গন থেকে লে ফেরার পথে হেমিস গুম্ফায়। কারু থেকে বাঁ দিকে চলে গেছে প্যাঙ্গন-এর রাস্তা— যে রাস্তায় গেলাম এলাম। আর ডান দিকে সিন্ধু নদী পেরিয়ে হেমিস গুম্ফা। লে থেকে হেমিসের দূরত্ব ৪৩ কিলোমিটার। হেমিস গুম্ফাটি তৈরি হয়েছে ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে। বিশাল এই গুম্ফায় রয়েছে থাঙ্কা, দেওয়াল চিত্র, বুদ্ধমূর্তি। এইসব বিশালকার চিত্র, মূর্তি বেশ সম্ভ্রম জাগায়। প্রতি বছর জুন মাসে এখানেও উৎসব হয়। এদিন লে-তে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। এখানে সন্ধ্যে হয় সাড়ে আটটা নাগাদ। বিদ্যাভারতীর স্কুলের প্রাঙ্গণে তখন লাদাখ কল্যাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে ছিল সিন্ধু দর্শন যাত্রীদের স্বাগত সভা। আমরা সেখানে গিয়েই বসলাম।

পরদিন গেলাম খারদুংলা। লে থেকে খারদুংলার দূরত্ব ৪৫ কিলোমিটার। বিশ্বের সর্বোচ্চ গাড়ি চলার পথ। খারদুংলার উচ্চতা ১৮৩৬০ ফুট। প্রচণ্ড হাওয়া বইছে। অথচ হাওয়ায় অক্সিজেনের ভাগ খুবই কম। বেশিক্ষণ এখানে থাকা যায় না। থাকা গেলও না। নিরাপত্তারক্ষীরাই বেশিক্ষণ থাকতে দিচ্ছে না। চারদিকে কারাকোরাম পর্বতমালার শৃঙ্গগুলিতে জমাট বরফ। লাদাখের নুব্রা উপত্যকার এই স্থানে রয়েছে সেনাদের পরিচালিত স্যুভেনিরের দোকান। এখানে আসার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে মানিকদা একটা সোয়েটার কিনলেন। নুব্রা উপত্যকাকে সাদা বালির মরুভূমি বলা যায়। বালিয়াড়ির মাঝে মাঝে কাঁটাঝোপ, আবার মরুদ্যানও রয়েছে কোথাও কোথাও। নুব্রা শব্দের অর্থ হল বাগান। লাদাখের মরুদ্যান হলো এই নুব্রা। রাজস্থানের মতো এখানে উট আছে, তবে অত লম্বা নয়। এখানকার উটের আবার দুটো কুঁজ। রাজস্থানের জয়সলমীরের মরুভূমিতে উটে চাপার সুযোগ হয়েছিল বটে, এখানে তা হলো না। ডেসকিট এই উপত্যকার মহকুমা শহর। এখান থেকে সিয়াচীন যাওয়া যায়। তবে তা সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু আমাদের ডেসকিট-এ যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো। সেই জম্মু থেকে লে— এই ৭০০ কিলোমিটার পথের নানা স্থানে কত যে নির্মাণ কাজ চলছে তা বলার নয়। কোথাও রাস্তা, কোথাও ব্রিজ, কোথাও ফ্লাইওভার, কোথাও বুলডোজার দিয়ে পাথর সরানো হচ্ছে, কোথাও বা বরফ। শ্রীনগর-লে ন্যাশনাল হাইওয়ে— দেশের ১ নম্বর হাইওয়ে। স্থানে স্থানে কিছুটা অংশ পাকা রাস্তা— বেশিরভাগটাই কাঁচা এবড়ো, খেবড়ো পাহাড়ী পথ। বি আর ও অর্থাৎ বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন কেন্দ্রীয় সংস্থা। এদেরই তত্ত্বাবধানে এই ব্যাপক নির্মাণ কাজ চলছে। পাশাপাশি রয়েছে বি এস এফ বা সীমা সুরক্ষা বল। বস্তুত পুরো রাজ্যটাতেই ছড়িয়ে রয়েছে বি এস এফ ক্যাম্প। বেশ পরিপাটি করে সাজানো গোছানো বিরাট পরিসর। সেনাবাহিনীর অসংখ্য গাড়ি— ধূসর রঙের টাটার তৈরি ট্রাক। অনেকগুলি যুদ্ধের ট্যাংক-কে বিশ-বাইশ চাকার লম্বা ট্রাকে বয়ে নিয়ে যেতে দেখলাম। কোনও কোনও ক্যাম্পে হেলিপ্যাড রয়েছে। একটা ক্যাম্পে ছোট হেলিকপ্টারও চোখে পড়ল। প্যাঙ্গন বা খারদুংলার মতো জায়গায় যেতে হলে নিরাপত্তা বাহিনীর অনুমতি প্রয়োজন। সেটা অবশ্য উদ্যোক্তারা আগেই নিয়ে রেখেছিলেন। শ্রীনগর থেকে রেল লাইনের কাজও এগুচ্ছে। বানিহালে রেলের জন্য টানেল তৈরি হচ্ছে। ট্রেনের একটা কামরা ট্রাকে চাপিয়ে নিয়ে যেতে দেখলাম।

এই দীর্ঘ পথে রয়েছে বহু ছোট-বড় গ্রাম, গঞ্জ, বাজার-বসতি। দোকান-বাজার, স্কুল-কলেজ, অফিস বা আদালতে— প্রায় সবারই নেম প্লেট বা সাইনবোর্ড ইংরাজিতে লেখা— উর্দু নেই বললেই চলে। শ্রীনগরে কিছু উর্দু খবরের কাগজ দেখলাম বটে, তবে লালচকে এক কাগজওয়ালা নিজেই জানাল— সেখানে বেশি চলে ইংরেজি কাগজ— গ্রেটার কাশ্মীর। সেই একটা কাগজও কেনা হল।

আমরা যখন লে-তে তখন মসজিদ পুড়িয়ে দেওয়া নিয়ে শ্রীনগর উত্তাল। কার্ফু জারি হয়েছে। দু'দিন বন্ধ। অমরনাথ যাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য এটা যে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের একটা গভীর ষড়যন্ত্র স্থানীয় প্রশাসনও তা জানে। তাই শ্রীনগর এড়িয়ে বাইপাস হয়ে যাওয়া হলো। শ্রীনগরে বাইপাসের পাশে পাশে ঝিলমও কিছুটা আমাদের সঙ্গে চলল। ছোট ছোট ঢেউ তুলে বয়ে চলেছে ঝিলম। পাশে ক্ষেত, ছোট ছোট গ্রাম, আপেলের বাগান, পর্ণমোচী গাছের ঝাড়। সবুজে ঢাকা বিস্তৃত উপত্যকা। চোখ জুড়িয়ে যায়।

শ্রীনগরে যাত্রা বিরতি না হওয়ায় পুরো রাতটা বাসেই কাটল। বানিহালের আগে একটা লঙ্গরে রাতের আহার সারলাম। অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়েছে। পথের পাশেই যাত্রীদের সেবার জন্য গড়ে উঠেছে লঙ্গর। বোম্ বোম্ ভোলে বোম্— ধ্বনি দিতে দিতে দিতে একদল যুবক নাচছে। যুবকরাই দেখলাম সংখ্যায় ভারী।

ইতিমধ্যে কয়েকজন সহযাত্রী বানতাল হয়ে অমরনাথে, কেউ কেউ আবার বৈষ্ণবদেবী দর্শনে চলে গেলেন। কেউ কেউ পুঞ্চে বুড়ো অমরনাথ দর্শনে যাবে বলেও শুনলাম। আমাদের জম্মু পৌঁছাতে পরদিন সকাল ন'টা বেজে গেল। সিন্ধু দর্শন উৎসবের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি হলো। তবুও ছোট গল্পের মতো শেষ হয়েও না হইল যেন শেষ। এর আগে এরকম প্যাকেজ ট্যুরে কোথাও যাইনি। এতজন একসঙ্গে একটা পরিবারের মতো এই যাত্রা— এক ভিন্ন স্বাদের অভিজ্ঞতা। ভারতের নানা প্রান্তের মানুষের সঙ্গে এই নবরাত্রি যাপন— সিন্ধু দর্শনের সঙ্গে এক অর্থে ভারতদর্শনও। তাই 'দেব দর্শন বার বার, সিন্ধু-দর্শন একবার'— উৎসবের এই ধ্বনি তাই সর্বার্থেই সার্থক। □

ত্যাগী ছাড়া লোকশিক্ষা
হয় না

—শ্রীরামকৃষ্ণ

Sandip Das,

South Kolkata

ALOEVERA A WONDER PLANT

Use EXOTICA brand ALOEVERA JUICE
Consume 30 ml. daily in empty stomach
Controls Acidity, Gas, Indigestion, Constipation etc.

Use ALOEVERA MULTI PURPOSE GEL
Keeps Skin healthy, useful for prevention of dandruff and hairfall

Use ALOEVERA CONDITIONER SHAMPOO
Suitable for normal & dry hair, prevents dandruff and impart & Luster Softness to hair.

Contact : Tele : 9133 2236 1706 / 1707

FREE HOME DELIVERY FOR ORDER ABOVE RS. 450/- WITH IN KMC LIMIT.

দেশে দেশে 'ডাকঘর'

বিকাশ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রূপকাশ্রয়ী নাটক 'ডাকঘর' প্রকাশ করেন ১৬ জানুয়ারি, ১৯১২। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গীতাঞ্জলির পর ভারতের স্বরূপ জানবার সুযোগ বেশি বেশি এসেছে এই নাটকেই। ডাকঘর-কে আমরা নানা পরিবেশে বিচিত্র সংকটমুহূর্তে দেশে দেশে প্রযোজিত হতে দেখেছি। আজও রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রেক্ষিতের সৃষ্টিক্ষমতা শুধু আমাদের কাছেই নয়— বহু বিদেশীর চোখেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, উপন্যাস ও গল্প নিয়ে যত আলোচনা বা চর্চা হয়েছে, কবির নাটক নিয়ে মনে হয় ততটা চর্চা হয়নি। অথচ মানবজীবনের বহু বিচিত্র বিষয় তাঁর বিভিন্ন নাটকে স্থান পেয়েছে। তাঁর নাটকের সংলাপে, চরিত্রের টানাপোড়েনে মানুষের সাধারণ প্রবণতাগুলিকে আলোড়িত করার কবির যে আকুলতা, তা আমরা দেখি তাঁর বিভিন্ন নাটকে। ডাকঘর কবির এমনই একটি নাটক। একশো বছর আগে (ডাকঘর রচনাকাল, ১৯১১ এবং প্রকাশিত হয় ১৬ জানুয়ারি, ১৯১২) লেখা এ নাটক যে আজও কতটা প্রাসঙ্গিক, সে কথাই তুলে ধরার চেষ্টা করব এ রচনায়।

মিলান-এ ডাকঘর নাটকে অমল।

'ডাকঘর' রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতাঞ্জলি-গীতালি পর্বে লিখেছেন। সে সময়ে কবি বিশেষভাবে মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষায় এক অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় কাল কাটাচ্ছেন। মানসিক দৌর্বল্য আর সংসার-সম্বন্ধীয় এক ক্লান্তি যেন তাঁকে পেয়ে বসেছিল। মনের এই অবসন্নতা থেকে তিনি বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছিলেন। এই সময়ে (১৩১৮) হেমলতা দেবীকে লেখা এক চিঠির এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "...নিজের বাইরের আবেষ্টন ভেদ করে আপনার যথার্থ সত্যরূপটিকে লাভ করবার জন্য ভারি একটা বেদনা বোধ করছি। সেই চিন্তা আমাকে এক মুহূর্ত বিশ্রাম দিচ্ছে না। কেবলি বলছে, বেরও, না বেরোতে পারলে অন্ধকারের পর অন্ধকার— আপনার প্রকাশ একেবারে আচ্ছন্ন— আমি যেন আর সহ্য করতে পারছিনে, বেরও, বেরও, বেরও... একবার নির্মল মুক্তির মধ্যে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস গ্রহণ কর— আর নয়— আর দিনের পর দিন এমন ব্যর্থতার মধ্যে কেবলি নষ্ট করে ফেলা নয়— কোথায় ভূমা কোথায়— কোথায় সমুদ্রের হাওয়া, আকাশের আলো, অপরিমিত প্রাণের বিস্তার। ..." এরপরেই অপর আর একটি চিঠিতে কবি লিখেছেন, "... এখানে (শিলাইদহ) আসবামাত্রই আমার সেই অসহ্য ক্লান্তি ও দুর্বলতা দূর হয়ে গেছে। এমন সুগভীর আরাম আমি অনেকদিন পাইনি। এই জিনিসটি খুঁজতেই আমি দেশ-দেশান্তরে ঘুরতে চাচ্ছিলুম; কিন্তু এ যে এমন পরিপূর্ণভাবে আমার হাতের কাছেই আছে সে জীবনের ঝঞ্ঝাটে ভুলেই গিয়েছিলুম। কিছুকাল থেকে মনে হচ্ছিল মৃত্যু আমাকে তার শেষ বাণ মেরেছে এবং সংসার থেকে আমার বিদায়ের সময় এসেছে— কিন্তু যস্য ছায়ামৃতং তস্য মৃত্যুঃ, মৃত্যুও যাঁর অমৃতও তারি ছায়া— এতদিনে আবার সেই অমৃতের পরিচয় পাচ্ছি।"

'ডাকঘর' নাটকটি রবীন্দ্রনাথের আপন মৃত্যুভাবনা থেকে সৃষ্টি হয়েছে— এ ধারণা অমূলক নয়। ১৯১৫ সালে কবি আশ্রমবাসীদের কাছে তাঁর নাটকের বিষয়-ভাবনা ও পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে কতগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলেন; বক্তৃতার এক পর্বে ডাকঘর বিষয়ে তিনি জানিয়েছেন যে, আকস্মিক ভাবে তাঁর মনের ভেতরে দেয়ালঘেরা পরিচিত জগত থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়বার আহ্বান হাতছানি দিয়েছিল; অবসন্ন কোনও অবসরে অলস প্রহর কাটানোর সময় তখন তিনি অনুভব করতেন মৃত্যু-অভিমুখে কিংবা চরম মুক্তির দিকে ধাবিত হবার ডাক। তিনি কবি, তাই বুঝতে পেরেছিলেন যে, মনের ভেতরের কোনও অপ্রকাশ্য অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারলে কিছুটা হলেও শান্তি পাওয়া যায়। সেই অভিপ্রায় থেকেই এই নাটকটির প্লট সাজিয়েছেন তিনি। মাধবের সঙ্গে অমলের কথোপকথন থেকে

আমরাও জেনে নিতে পারি কবির গভীর জীবনবোধের কথা :

অমল : আমি যদি কাঠবিড়ালি হতুম তবে বেশ হত। কিন্তু পিসেমশাই, আমাকে কেন বেরোতে দেবে না?

মাধব দত্ত : কবিরাজ যে বলেছে বাইরে গেলে তোমার অসুখ করবে।

অমল : কবিরাজ কেমন করে জানলে?

মাধব দত্ত : বল কী অমল! কবিরাজ জানবে না! যে এত বড়ো বড়ো পুঁথি পড়ে ফেলেছে।

অমল : পুঁথি পড়লেই কি সব জানতে পারে?

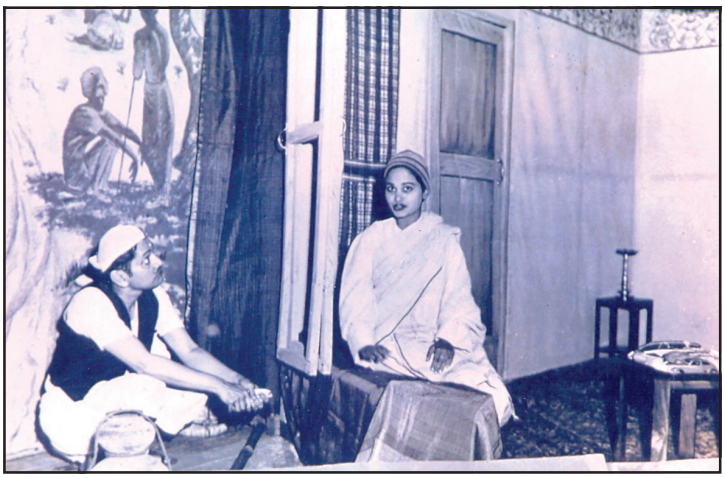

নাইরোবি-তে অভিনীত 'ডাকঘর'-এ দইওয়ালা ও অমল।

মাধব দত্ত : বেশ। তাও বুঝি জান না?

অমল : (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) আমি যে পুঁথি কিছুই পড়িনি— তাই জানিনে।...

অমল : আমি, যা আছে সব দেখবো— কেবলই দেখে বেড়াব।

মাধব দত্ত : শোন একবার। দেখবে কী? দেখবার এত আছেই বা কী?

অমল : আমাদের জানলার কাছে বসে সেই যে দূরে পাহাড় দেখা যায়— আমার ভারি ইচ্ছে করে এই পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই। ....'

পৃথিবীর চিরায়ত এক ছবি নাট্যকার অমলের কল্পনাজগতে সাজিয়ে তুলেছেন। অমল যেন এক চিরন্তন পৃথিবী-পথিক। অমলের মুক্তি পাগল মন তাই দইওয়ালা হয়ে দূর গ্রামে দই বেচতে চায়, ডাক হরকরার মতো চিঠি বিলিয়ে বেড়াতে চায়, সুধার সঙ্গে ফুল কুড়াতে চায়, ঘন্টাবাদক হয়ে বাজাতে চায় সময়ের ঘন্টা, ঢং ঢং ঢং। জগতকে জীবনকে দেখবার যে আনন্দ, তা থেকে দূরে সরে থেকে সত্যিকারের আনন্দকে ধরা যায় না— এই সত্য জানাতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ অমলের ভাবগতির অনুভবের মধ্য দিয়ে।

১৩১৮ সালে ভাদ্র মাসের শেষাশেষি শান্তিনিকেতনে বসে কবি 'ডাকঘর' লেখেন। পুজোর ছুটিতে কলকাতায় এলে বালিগঞ্জে মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে বন্ধুমহলে নাটকটি পড়ে শোনান। 'ডাকঘর' প্রকাশিত হয় ১৬ জানুয়ারি ১৯১২। একবার বক্তৃতা প্রসঙ্গে কবি বলেছিলেন, ''ডাকঘর যখন লিখি তখন হঠাৎ আমার অন্তরের মধ্যে আবেগের তরঙ্গ জেগে উঠেছিল। ... কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয় মিলে খুব একটা আবেগে সেই চঞ্চলতাকে ভাষাতে ডাকঘর-এ কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম।'' আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গীতাঞ্জলির পর ভারতের স্বরূপ জানবার সুযোগ বেশি বেশি এসেছে রবীন্দ্রনাথের রূপকাশ্রয়ী যে ক'টি নাটকে, তার মধ্যে ডাকঘর প্রধানতম।

ডাকঘরকে আমরা নানা পরিবেশে বিচিত্র সংকটমুহূর্তে দেশে দেশে প্রযোজিত হতে দেখেছি। আজও রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রেক্ষিতের সৃষ্টি ক্ষমতা শুধু আমাদের কাছেই নয়— বহু বিদেশীর চোখেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

প্রকাশিত হওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যেও ডাকঘর এদেশে মঞ্চস্থ হয়নি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র দেবব্রত মুখোপাধ্যায় এ নাটকের ইংরাজি করেন। নাম দেন 'পোস্ট অফিস'। এর ভূমিকা লেখেন রবীন্দ্রানুরাগী কবি ইয়েটস। এঁরই আগ্রহ ও উৎসাহে এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের সম্মতিতে ১৯১৩ সালের ১৭ মে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহরের অ্যাবে থিয়েটারে এই নাটকের অর্থাৎ পোস্ট অফিস-এর প্রথম অভিনয় হয়। দেশ বিদেশ মিলিয়ে এটিই 'ডাকঘর' নাটকের প্রথম মঞ্চায়ন।

১৯১৭ সালের ১০ অক্টোবর জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনের দোতলায় এদেশে 'ডাকঘর'-এর প্রথম অভিনয়। দর্শকাসন ছিল দেড়শো। এই পর্যায়ে মোট ৭টি অভিনয় হয়। পরিচালনায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ভূমিকালিপি : ঠাকুর্দা রবীন্দ্রনাথ, মাধব দত্ত : গগনেন্দ্রনাথ, মোড়ল ও কবিরাজ : অবনীন্দ্রনাথ, রাজ কবিরাজ : রথীন্দ্রনাথ, দইওয়ালা : অসিত হালদার। অমলের ভূমিকায় অভিনয় করেন আশামুকুল দাস। এই নাটকে অভিনয়ের আগে পিতৃহীন আশামুকুল কলকাতার ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলের ছাত্র ছিল। সুধার ভূমিকায় অভিনয় করে অবনীন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে সুরূপা। স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন, ''... রবিদাদা বাবাকে (অবনীন্দ্রনাথকে) হুকুম করলেন— তোমাদের বাড়ির একটি ছোট মেয়ে জোগাড় কর। বাবার সঙ্গে ভয়ে ভয়ে আমি আর আমার এক দিদি রবিদাদার কাছে গেলাম। ... রবিদাদা আমাকে সুধা ঠিক করলেন। .... দর্শকদের হাসিয়ে কাঁদিয়ে আমাদের অভিনয় চমৎকার উত্তরে গেল। লাটসাহেবের মেম এবং সাহেব 'ডাকঘর' দেখতে এসে খুব তারিফ করে গেলেন। আমাদের কেউ মেডেল দেয়নি, কিন্তু সবাই এত আদর করেছিলেন যে কি বলব। আমরা যখন ছোট তখন শিশুদের অভিনয় করাতে কেউই সাহস করতেন না, রবিদাদাই প্রথম সাহস করে আমাদের মঞ্চে নামিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দিলেন, শিশু অভিনেতা কারুর চেয়ে কম নয়।''

'ডাকঘর'-এর প্রথম পর্যায়ের অভিনয়ের সময় কলকাতার ওয়াই এম সি এ হলে জাতীয় কংগ্রেসের আমন্ত্রণে একদিন সন্ধ্যায় বালগঙ্গাধর তিলক, মদনমোহন মালব্য, গান্ধীজী, অ্যানি বেসান্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ নাটক দেখতে আসেন। সীতাদেবী প্রথম ডাকঘর অভিনয়ের বর্ণনায় বলেছেন, ''... রবীন্দ্রনাথ সাজসজ্জা কিছুই করেন নাই, তবু

একবার বাউল সাজিয়া, 'গ্রামছাড়া ওই রাঙামাটির পথ আমার মন ভুলায় রে' গাহিয়া নৃত্য করিতে করিতে মাধব দত্তের ঘরের পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। ... আর একবার যবনিকার অন্তরাল হইতে গাহিয়া উঠিলেন, 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।' ডাকঘর-এর প্রথম অভিনয়ের মঞ্চসজ্জার প্রবাদপ্রতিম খ্যাতির অনেকটাই অবনীন্দ্রনাথের প্রাপ্য। তিনি স্মৃতিকথায় লিখেছেন, ''ডাকঘর অভিনয় হবে, স্টেজে দরমার বেড়ার ওপর নন্দলাল খুব করে আলপনা আঁকলে। একখানা খড়ের চালাঘর বানানো হল। তক্তায় লাল রঙ, ঘরের কুলুঙ্গি, চৌকাঠের মাথায় লতাপাতা, ঠিক যেখানে যেমনটি দরকার যেন একটি পাড়াগেঁয়ে ঘর। সব তো হল। আমি দেখছি, নন্দলালই সব করলে। ... তারপর হল আমার ফিনিশিং টাচ্।

''আমি একটা পিতলের পাখির দাঁড়ও একপাশে ঝুলিয়ে দেওয়ালাম। নন্দলাল বললে, পাখি?

''আমি বললুম, না, পাখি উড়ে গেছে, শুধু দাঁড়টি থাক্।

'দেখি দাঁড়টি গল্পের আইডিয়ার সঙ্গে মিলে গেল...।"

ডাকঘর নাটকের রিহার্সালের সময় এক মজার ঘটনার উল্লেখ করেছেন আশামুকুল, ''আমি বলে যাচ্ছি— গুরুদেব যেখানে যা হবার দেখিয়ে দিচ্ছেন। একটা জায়গায় গিয়ে আটকে গেল।.... জায়গাটা হল, মাধব দত্তের কথার পরে অমল বলবে, 'যে যে (দইওয়ালা) বলেছিল আমার সঙ্গে তার বোনঝির বিয়ে দেবে।'.... এই জায়গায় এসে আমি থেমে যাচ্ছিলাম। ... গুরুদেব ভাবছেন কি করা যায়— হয়তো ভাবছেন একটু অদল বদলের কথা— কিন্তু তবু বলছেন, 'বলই না। সত্যি তো তুই আর বিয়ে করতে যাচ্ছিস না? কি বলো অবন?' অবন তক্ষুনি সায় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ বলতেই হবে। এইটাই তো সবচেয়ে আসল জায়গা— এ বাদ দেওয়া যায় না।" তবু আশামুকুলের অস্বস্তি দেখে কবি রিহার্সালের পর তাঁর কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, ''তুই তো অভিনয় করছিস। ব্যাপারটা ভাল করে বুঝেই দেখ না, তুই তো আর দইওয়ালার বোনঝিকে বিয়ে করতে চাচ্ছিস না— চাইছে অমল। তোর কাজ হচ্ছে অমলের ভাব ফুটিয়ে তোলা।.. পরদিন থেকে রিহার্সাল আর আটকালো না।"

১৯১৭-১৮ সালের পর রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৯ সালে আর একবার 'ডাকঘর' অভিনয়ের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। এই সময় শান্তিনিকেতনে মহিলা অভিনেত্রীর সংখ্যা বেশি থাকায় দুটি নারী চরিত্র সৃষ্টি করা হয়। প্রথম চরিত্রটি ঠাকুরদার এক সঙ্গিনী। যাকে ঠাকুরদা বারবার খঞ্জনয়নী বলে সম্বোধন করেছেন। খঞ্জনয়নীর কণ্ঠে একটা গানও দেওয়া হয়েছে— 'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা মনে মনে।' ঠাকুরদার সঙ্গিনী ছাড়া দইওয়ালাকে দইওয়ালী করে আরও একটি স্ত্রী ভূমিকা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পিসেমশাইকে করা হয়েছে পিসিমা। অমলের মৃত্যুর পর ঠাকুরদার কণ্ঠে একটি গানও রেখেছিলেন— 'সম্মুখে শান্তি পারাবার / ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।'

জার্মানীতে অভিনীত নাটকে অমল ও সুধা।

এই ঈষৎ পরিবর্তিত ডাকঘরের মহলাও তিনি আরম্ভ করেন। তিন-চার মাস রিহার্সালও চলে। কিন্তু শেষপর্যন্ত অভিনয় হয়নি। কবির ভগ্নস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে, শেষপর্যন্ত তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করা হয়। তবে ১৯৪১ সালে বাস্তবের অমল যখন চলে গেলেন, তখন তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে গাওয়া হয়— 'সম্মুখে শান্তি পারাবার...।'

১৯১৭-১৮ সালে রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় ডাকঘর মঞ্চায়নের পর বিদেশের বিভিন্ন শহরে এ নাটকের বহু অভিনয় হলেও এদেশে ডাকঘরের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠীর। তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনায় প্রথম অভিনয় ১৯৫৭ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি নিউ এম্পায়ার প্রেক্ষাগৃহে। অভিনয়ে রাজ কবিরাজ : শম্ভু মিত্র, মাধব দত্ত : গঙ্গাপদ বসু, মোড়ল : অমর গাঙ্গুলী এবং ঠাকুর্দা : কুমার রায়। অমলের ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করেন শাঁওলি মিত্র। এছাড়াও এদেশের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা মণিপুরের কলাক্ষেত্র নাট্যগোষ্ঠীর। এর প্রতিষ্ঠাতা নির্দেশক কানহাইয়ালাল হেইসনাস এক বিশেষ নাট্যশৈলীর মাধ্যমে নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। বহুভাষিক এই প্রযোজনায় মুক্ত আলো হাওয়া থেকে বঞ্চিত। বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ মুক্তিপিয়াসী অমলের ভূমিকায় কলাক্ষেত্রের বয়স্কা অভিনেত্রী সাবিত্রী দেবীর অনবদ্য অভিনয় এ নাটকের সম্পদ।

মারাঠি ভাষায় সর্বপ্রথম ডাকঘর অনুবাদ করেন ১৯২৬ সালে কাশীনাথ বিনায়ক ভাগবত। ১৯৬০ সালে মারাঠি ডাকঘর 'রাজাচেপত্র' অভিনয়ের মধ্য দিয়ে মুম্বাইয়ের রঙ্গায়ন নাট্যগোষ্ঠীর যাত্রা শুরু হয়। পরিচালনায় ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী বিজয়া মেহতা। আর এক মারাঠি অভিনেত্রী সুলভা দেশপাণ্ডে মারাঠি ডাকঘর পরিচালনা করেন। প্রযোজনায় আবিষ্কার গোষ্ঠী। এটি ১৯৮৭ সালে কলকাতায় নান্দীকার আয়োজিত জাতীয় নাট্যোৎসবে অভিনীত হয়। এছাড়া অসমিয়া, ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম— এমনকি পাঞ্জাবীতেও ডাকঘর অনূদিত হয়েছে এবং অভিনয়ও হয়েছে।

শুভ শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

সর্ব্বদা ইষ্ট চিন্তা করলে, অনিষ্ট আসবে কোথা দিয়ে।

—মা সারদা

A WELL WISHER

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ডাকঘর-এর অমোঘ প্রভাব, বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা এবং মানবিক আবেদনের কথা বলি। গত শতকের প্রথমার্ধে উইলিয়াম রাদিচের অনুবাদে ডাকঘর ইংলন্ডেও মঞ্চস্থ হয়। বিশিষ্ট ফরাসী সাহিত্যিক আঁন্দ্রে জিদ্ ১৯২২ সালে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন 'অমল ও রাজার চিঠি' নাম দিয়ে। বিশিষ্ট রবীন্দ্র-গবেষক সাধন চট্টোপাধ্যায় বিদেশের মাটিতে ডাকঘর-এর মঞ্চায়ন প্রসঙ্গে যে কথাগুলি লিখেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর কথায়, ''... ডাকঘর প্রতীকধর্মী নাটক। এর চরিতার্থতা তাই দেশে দেশে, যুগে যুগে কল্পনার বহুত্বে রূপ পেয়েছে। যেমন প্রাচ্য সংস্কৃতির দেশ ভারতবর্ষে অমল-অস্তিত্বের মধ্যে প্রকৃতি ও মানবজীবনের দ্বন্দ্বের একটি রূপ ফুটে উঠেছে, ঠিক তেমনই ফ্রান্সের মতো খৃষ্টীয় নান্দনিকতার সমাজে আত্মা, ঈশ্বর, বেদনা, পাপপুণ্য, ধারণার একটি বৃহৎ মানবিক চেতনা উঠেছে ফুটে। নাটকটির গভীরে আছে মানবতন্ত্রের আন্তর্জাতিক মহিমা। তাই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান কর্তৃক প্যারির পতন যেদিন ঘটেছিল, প্যারিসের জাতীয় বেতারে ডাকঘর প্রযোজনা করা হয়েছিল।" বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক মার্টিন কেম্পসেন জার্মান ভাষায়, ডাকঘর অনুবাদ করেন জার্মান অনূদিত নাটকটি সুইজ্যারল্যান্ড ও জার্মানিতে মঞ্চস্থ হয়েছিল উল্‌ফ্রেম মেহরিং-এর পরিচালনায়। তাঁর প্রযোজিত ও পরিকল্পিত নাটকটির বাংলা ভাষ্যটির পরিচালনার জন্য মেহরিংকে কলকাতায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

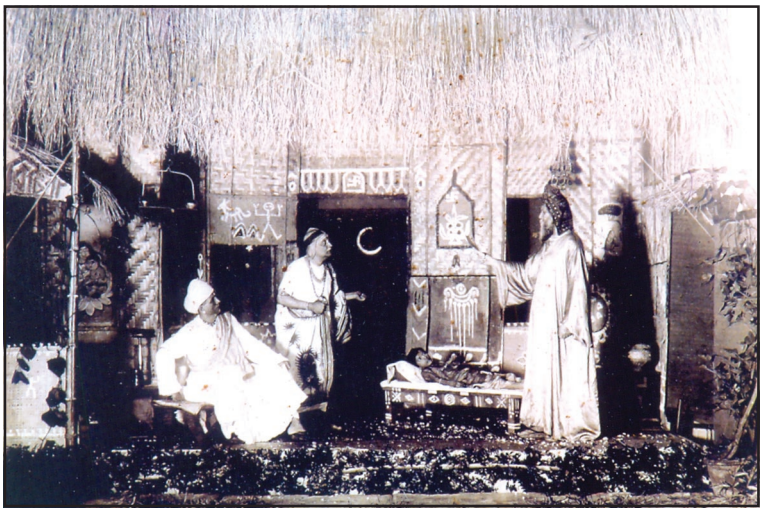

'ডকঘর' নাটকে রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথ।

পোলান্ডের রাজধানী ওয়ারশ-এর এক ইহুদি ঘেন্টোতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এক পোলিশ ডাক্তার জানুস কোরচখ তাঁর 'আওয়ার হোম' অনাথ আশ্রমের শিশুদের দিয়ে পোলিশ ভাষায় তাঁরই অনূদিত ডাকঘর মঞ্চস্থ করেন। দিনটা ছিল ১৮ জুলাই ১৯৪২। পরিচালনায় ছিলেন আশ্রমমাতা স্টেফানিয়া বিলৎজিন্স্কা। ডাঃ কোরচখ জানতেন তাঁর আশ্রমের সকলের ইহুদি হবার অপরাধে গ্যাস চেম্বারে মৃত্যু অবধারিত। বিষাদময় পরিণতি যাতে শিশুরা মেনে নিতে পারে, এই মানসিক শক্তি তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে ডাঃ কোরচখ রবীন্দ্রনাথের ডাকঘরকে আশ্রয় করেছিলেন। অভিনয়ের কিছুদিন পরেই অর্থাৎ ৯ আগস্ট ১৯৪২-এর ডাঃ কোরচখ সহ সমস্ত আশ্রমবাসীর নাৎসি বাহিনীর হাতে মৃত্যু হয়। বেঁচে গিয়েছিলেন শুধু একজন— যিনি সুধার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন— রেবেকা রথচাইল্ড। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই মর্মান্তিক ঘটনাটিকে অবলম্বন করে কথাশিল্পী নারায়ণ সান্যাল তাঁর 'মৃত্যোর্মা অমৃতম্...' উপন্যাসটি লিখেছেন। বছর দশেক আগে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। ইতালির মিলান শহরে ১৯২৫ সালে এবং ১৯৪৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার নাইরোবি শহরে কেনিয়া রিপাবলিক ডে উপলক্ষে 'ডাকঘর' মঞ্চস্থ হয়।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব আতাউর রহমানের কথায়, ''বাঙালির জীবনের সবচেয়ে বড়ো অবলম্বন রবীন্দ্রনাথ, শুধু তাই নয়, তিনি আমাদের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়ের স্মারকও বটে। বহির্বিশ্বের কোনও দেশের মানুষের কাছে দেশের পরিচিতি দিতে গিয়ে আমি প্রায়শই বলে থাকি, আমি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কথা বলি।... এই রবীন্দ্রনাথকে অর্জন করতে, তাঁকে নিজেদের করে পেতে বাংলাদেশের বাঙালিদের অনেক সংগ্রাম, দুঃখ কষ্ট ভোগ ও বৈরী পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তারপর আমরা আমাদের আপনজন হিসেবে তাঁকে পেয়েছি।" পাকিস্তান প্রশাসনের প্রবল বিরোধ সত্ত্বেও ওপার বাংলায় রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উৎসব উপযুক্ত মর্যাদায় পালিত হয়েছে। সে সময় যে চারটি রবীন্দ্রনাটক সেখানে মঞ্চস্থ হয়, তার মধ্যে অন্যতম ছিল 'ডাকঘর'। বর্তমানে পালাকার নাট্যদল ডাকঘর নিয়মিত অভিনয় করছেন। সম্ভবত পালাকার 'ডাকঘর'-এর শততম রজনী অতিক্রম করেছেন।

একটি নাটক নিয়ে তার দর্শন নিয়ে দেশে বিদেশে এত ঘটনা ঘটে যেতে পারে— এ ধারণা আমার ছিল না। রবীন্দ্র জন্মসার্ধশতবর্ষে এবং ডাকঘর রচনার শতবর্ষে 'ডাকঘর' নিয়ে একটি দেওয়ালপঞ্জী প্রকাশের প্রয়োজনে এ বিষয়ে খোঁজ শুরু করি এবং ক্রমশ অবাক হই রবীন্দ্রনাথের এই রূপক নাট্যের অসাধারণ প্রভাব ও আবেদন দেখে। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকগুলির তুলনায় ডাকঘর-এর একটি সহজবোধ্য আন্তর্জাতিক অবস্থান আছে। তাই ডাকঘর রচনার পর, গত একশো বছর ধরে পৃথিবী জুড়ে নানা সঙ্কট অস্থিরতায় ব্যক্তিজীবন, দেশ-জাতি দিন কাটিয়েছে, সংগ্রাম করেছে, নিশ্চিহ্ন হয়েছে, স্রষ্টা ও চিন্তাশীল মানুষের একটা অংশ বাঁচার পথ খুঁজছে ডাকঘর-এর নানা প্রযোজনার মাধ্যমে। □

তথ্যসূত্র : বহুরূপী ১১৫, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও ডঃ দিলীপ কুমার মিত্র।

চিত্র সৌজন্য : সংস্কার ভারতীর দেওয়ালপঞ্জী, ১৪১৯

With the best Compliments from :

A. S. TRADERS

Ramnagar Road
Bongaon (N) 24-Pgs.

With Best Compliments From :-

VARIETY AGENCY

Ramnagar Road, (Crossing of Jessore Road & Ramnagar Road)

LIC Building

Bongaon, (N) 24 Parganas

আপনার ঘর ভরে উঠুক সমৃদ্ধিতে

Steel এর আলমারী, সোকেস, ড্রেসিং টেবিল ইত্যাদি সকল প্রকার **Furniture** এর জন্য আসুন আমাদের কাছে।

Steel n Style
A furniture brand from TATA Steelium

শুভেচ্ছাসহ

Gurunath Furniture
Distibuture–Steel n Style
42/8 Rathtala, Jessore Road (s)
Barasat-700124
Mobile-9830614749, 9038474989

Please Contact

Om Prakash Saharan

M- 9830178883

Mfg. of - Cork Insole for Sheo Industries.

P.P. Caps
Induelion Washer
Cork Washer
Cork Sheet
Cork Products
Anti Uibration Pad for Generators.
Lowest Cost With High Technology

জ্বলন্ত মানুষ

গোপাল চক্রবর্তী

একটা জ্বলন্ত মানুষ রাস্তা দিয়ে ছুটছে, তার পেছনে লাঠিসোটা আর মশাল হাতে কিছু ক্ষিপ্ত জনতা। একবিংশ শতকের কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে এমন দৃশ্য কি কল্পনা করা যায়? হয়তো যায় না, কিন্তু এমন একটি ঘটনা ঘটেছে খোদ কলকাতার উপকণ্ঠে শহরতলীতে। এই ঘটনাটি অনেকেই প্রত্যক্ষ করে শিহরিত হয়েছে। কিন্তু কোনও প্রতিবাদ

ওঠেনি, না রাজনৈতিক ভাবে, না কোনও ধর্মীয় বা সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে। এতবড় একটা ঘটনা, কিন্তু কোনও প্রচার মাধ্যমেও উঠে আসেনি।

সেদিন সন্ধ্যার পর ঘরে বসে টিভি দেখছিল পঞ্চম। হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচি শুনে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে একটা জ্বলন্ত দেহ পাশের গ্রাম থেকে ছুটে আসছে, যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে কিছু প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ। বাড়ির সবার নিষেধ অমান্য করে রাস্তার দিকে এগিয়ে যায় পঞ্চম। ক্ষিপ্ত জনতা নিজেদের গ্রামের সীমানা পেরুতে সাহস করেনি। মানুষটি তখনও জ্বলছে, পঞ্চম অনেকটা ধাক্কা মেরে তাকে পাশের একটি পুকুরের মধ্যে ফেলে দেয়। আগুন অনেকটা নিভে এসেছিল, জলে পড়ে সম্পূর্ণ নিভে যায়। পঞ্চম এবার জলে নেমে মানুষটিকে তুলে নেয়। বছর পঁচিশের সুঠাম যুবক। দেহের পঞ্চাশ ভাগ পুড়ে গেছে, ততক্ষণে কয়েকজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে আশপাশে। বাড়ির লোকেরা নাকে রুমাল চাপা দিয়ে যে যার কাজে চলে গেল। একা পঞ্চম জ্বলন্ত মানুষটিকে রাস্তার ধারে বসিয়ে একটা গাড়ি ধরার চেষ্টা করছে, কিন্তু কোনও গাড়ি দাঁড়াচ্ছে না। মানুষটিকে এই মুহূর্তে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে সরকারি হাসপাতাল। অবশেষে একটা ভ্যানরিক্সা পাওয়া গেল। তাতে মানুষটিকে তুলে নিয়ে ছুটল হাসপাতালের দিকে। এবার মানুষটির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে পঞ্চম। মুখটা তেমন পোড়েনি, ক্ষীণ কণ্ঠে কথা বলতে পারছে মানুষটি।

অরিন্দম সেনের বাড়ি নবগ্রামে। বাবা অবিনাশ সেন প্রাইমারী স্কুল টিচার। তিন ভাইবোনের মধ্যে অরিন্দম বড়। বি এস সি পাশ করে একটি কমপিউটার কোম্পানীতে কাজ করে। মেজ বোন অঞ্জলি গ্রামের হাইস্কুলের প্যারাটিচার। ছোট ভাই অঞ্জন এবার হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার্থী। কলেজে পড়ার সময় ফতেপুরের রমজান আলির মেয়ে তহমিনার সঙ্গে অরিন্দমের ভালোবাসা হয়। দুজনেই ব্যাপারটি অত্যন্ত গোপন রাখে। বাড়ির লোক তো নয়ই, সহপাঠীদের মধ্যেও কেউ ব্যাপারটি আঁচ করতে পারেনি। অরিন্দম একদিন মায়ের কাছে সব খুলে বলল। মা বললেন—

— অসম্ভব। এ সম্পর্ক কেউ মেনে নেবে না। তুই একি করেছিস? তোকে নিয়ে আমাদের এত আশা ভরসা। আর তুই সব ধূলোয় মিশিয়ে দিলি? একি করলি বাবা! ওই মানুষটা একথা শুনলে যে আত্মঘাতী হবেন। আত্মীয়-স্বজন সব তোর দিকে চেয়ে আছে, আর তুই কিনা শেষে...

মায়ের গলা বুজে আসে, অরিন্দম বলে — মা, তুমি একবার ওকে দেখো, একটু কথা বলো, তখন বুঝতে পারবে, আমি কেন একাজ করেছি।

— আমার দেখা, কথা বলা বড় কথা নয়, সমাজ সংস্কার কি এটা মেনে নেবে? ওদের সমাজও এটা কিছুতেই মানবে না।

—ওদের সমাজের কথা ছেড়ে দাও মা, তুমি মেনে নিলেই আমার সব হয়ে যাবে।

কথা বলতে হাঁফিয়ে উঠেছে অরিন্দম, পঞ্চম বলল— থাক, এখন আর কথা ব'ল না। তোমার কষ্ট হচ্ছে। আমরা হাসপাতালের কাছাকাছি এসে গেছি। তুমি ভর্তি হও, চিকিৎসা হোক, সুস্থ হয়ে ওঠ, তখন তোমার সব কথা শুনব।

— না, যদি মরে যাই, যদি আর কথা বলতে না পারি! একজনকে অন্তত সব কথা শুনিয়ে যাই।

একটু থেমে সে আবার বলতে শুরু করে— মা একরকম রাজি হলেও বাড়ির অন্যান্যদের প্রচণ্ড আপত্তি। তাদের বোঝানো গেল না। একদিন দক্ষিণেশ্বরে মায়ের সঙ্গে তহমিনার দেখা করাল অরিন্দম। কিছুক্ষণ কথা বলেই মা গলে জল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ থেকে অজস্র উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করল, মেয়েদের কোনও জাত নেই, স্বামীর জাতই তার জাত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনার্য জাম্ববতীকে বিবাহ করেছিলেন। ক্ষত্রিয় রাজকুমার ভীম মাতা কুন্তীর আদেশে রাক্ষসী হিড়িম্বাকে বিবাহ করেছিলেন। আবার ক্ষত্রিয় রাজা যযাতি বিবাহ করেছিলেন উগ্র ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে। এসব বিবাহ তো অবৈধ হয়নি, সমাজ তো সব মেনেও নিয়েছিল।

— ওরা ছিলেন সব মহাপুরুষ, রাজা-রাজড়া, ওদের কথা আলাদা। আমরা যে সাধারণ মানুষ মা! সমাজ নিয়ে আমাদের চলতে হয়, সমাজের বিধি-নিষেধ মানতে হয়।

— এই সমাজের আগলটা আমাদের ভাঙতে দাও না মা। আমরা সবাই তো অমৃতের সন্তান। তবু কেন এত জাত, কেন এত বিভেদ, কেন এত হানাহানি?

— বাবা, তোর সঙ্গে কথায় আমি পেরে উঠব না মা। এই বয়সে এত কথা তুই কোথায় শিখলি, খুব বই পড়িস বুঝি?

— বইয়ে তো সব কথা লেখা থাকে না, মা। কিছু কিছু জিনিস অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়।

— ওরে বাবারে, এ যে আমার শাশুড়ি ঠাকরুণের মতো কথা বলে। তোকে যত তাড়াতাড়ি পারি আমার কাছে নিয়ে যাব।

মা তহমিনাকে বুকের কাছে টেনে নিলেন।

তহমিনা সুন্দরী, হিন্দু ঠাকুর দেবতার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের পরম ভক্ত। এই বয়সেই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ,

উপনিষদ পড়ে নিয়েছে, শুধু পড়া নয়, আত্মস্থ করেছে। ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারে। কলেজের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তহমিনার সঙ্গে আলাপ হয় অরিন্দমের। তারপর ভালবাসা। অরিন্দম প্রথমে ভয় পেয়েছিল মুসলমানের মেয়ের সঙ্গে প্রেম? জানাজানি হয়ে গেলে? তহমিনাই সাহস জুগিয়েছে। ভয়কে জয় করার সাহস। বি এ পাশ করার পর বাড়ি থেকে তহমিনার বিয়ের সম্বন্ধ দেখতে থাকে। ভাল ভাল পাত্রের সন্ধানও আসে। কেউ পাতিপুকুরে মাছের আড়ৎদার। কারও কোলে মার্কেটে কাঁচা সব্জির ব্যবসা। আবার কেউ বা ট্যাংরায় চামড়ার কারবারি। সব পয়সাওয়ালা।

তহমিনা বলে— তুমি একটা চাকরি যোগাড় করে আমাকে আগে উদ্ধার কর। তারপর আমি একটা কাজটাজ পেয়ে গেলে তুমি আবার পড়াশুনা শুরু করবে, আমি তোমার ক্যারিয়ার নষ্ট করবো না।

ভাল ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও এম এস সি পরীক্ষা না দিয়ে অরিন্দমকে চাকরি করতে হল। বাবা বললেন— পরীক্ষা না দিয়ে এই মুহূর্তে তোমার চাকরির কী প্রয়োজন ছিল?

—না, চাকরিটা হঠাৎ পেয়ে গেলাম। মাইনেও ভালোই দেবে। আবার থেমে যায় অরিন্দম, বলে— একটু জল।

পঞ্চম ভ্যানওয়ালাকে বলে— ভাই, ওই দোকানটার সামনে একটু দাঁড়াবে? দোকান থেকে এক বোতল জল নিয়ে অরিন্দমের মুখে একটু একটু করে ঢেলে দিল পঞ্চম।

একদিন অরিন্দমের মা, বাবার কাছে কথাটা পাড়লেন।

— তোমাকে একটা কথা বলার ছিল।

— বলে ফেলো।

— খোকা, একটা মেয়েকে ভালোবাসে।

— ও, তাই বুঝি তাড়াতাড়ি চাকরি ধরতে হলো!

— মেয়েটি খুব ভালো, জানো, যেমন সুন্দরী, তেমনি গুণ।

— ওঃ, তোমারও দেখা হয়ে গেছে?

— না, সেদিন দক্ষিণেশ্বরে গেলাম না, সেখানে দেখা হলো।

— তা, বেশ তো, এবার ঘরের বৌ করে ঘরে নিয়ে এসো।

— কিন্তু সেখান যে একটা বড় সমস্যা।

— সমস্যা, তোমার এত পছন্দ, এত সার্টিফিকেট, সেখানে আবার সমস্যা কিসের?

— মেয়েটা যে মুসলমান।

অবিনাশবাবু সোজা হয়ে বসলেন, তাঁর মুখে কথা যোগালো না।

অরিন্দম বার্নিং ওয়ার্ডে ভর্তি হলো। পঞ্চম ঠিকানা আর ফোন নম্বর নিয়ে অরিন্দমের বাড়িতে খবর দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে অরিন্দমের ছোট ভাইকে নিয়ে মা চলে এলেন। পুলিশ কেস।

ডাক্তারবাবুরা খানিকটা ইতস্তত করে চিকিৎসা শুরু করলেন। পরদিন সকালে পঞ্চম এসেছে। অরিন্দমের মা ভায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, ওরা পঞ্চমের কাছে কৃতজ্ঞ। আয়া এসে একটা প্রেসক্রিপশন ধরিয়ে দিয়ে গেল ওষুধ, ইনজেকশানগুলি এক্ষুণি চাই। পঞ্চম আর অঞ্জন দোকান থেকে ওষুধগুলি কিনে ওয়ার্ডে দিতে গেল আর সেই সময়ে এল লোকাল থানার পুলিশ অরিন্দমের জবানবন্দি নিতে।

অরিন্দমের বাড়িতে একমাত্র মা ছাড়া আর কেউই এই বিয়েতে রাজি নয়। এদিকে তহমিনার বাড়িতে বিয়ের তোড়জোড় চলছে। যে কোনওদিন তহমিনাকে পরের ঘরে চলে যেতে হতে পারে। এই সময়ে তহমিনা একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে এলো। দুর্গানগরে একটা বাড়ি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল অরিন্দম। প্রথমে রেজিস্ট্রি, পরে কালীঘাটে গিয়ে বিয়ে করলো ওরা। দুর্গানগরের সেই বাড়িতে বাস করতে লাগল। মা এসে নতুন বৌমাকে আশীর্বাদ করে গেলেন। তহমিনার বাড়ি থেকে পুলিশ কেস করা হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় আইনে হিন্দু মুসলমানের বিয়ে অবৈধ নয়। তাই পুলিশ কিছু করতে পারল না। আনন্দেই চলছিল ওদের দু'জনের সংসার। অবিনাশবাবুকেও অরিন্দমের মা প্রায় রাজি করিয়ে ফেলেছে। একটা বিয়ের দিন দেখে ওদের আবার অনুষ্ঠান করে বিয়ে দেবার কথাও ভাবা হচ্ছে। তহমিনা সুন্দর সংসার পেতেছে। হাতে শাঁখা সিঁথিতে সিঁদুর, লালপেড়ে শাড়ি পরে বৃহস্পতিবার সন্ধেবেলায় লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ছে। প্রতিবেশিনী এক মাসিমা সেদিন বলেই ফেললেন— বৌমা কি বামুনের ঘরের মেয়ে না কি গো?

তহমিনা হাসে, কোনও উত্তর দেয় না। মা এসে একদিন ঘর সাজিয়ে দিয়ে গেছেন, বৌমার গলায় দেড় ভরি ওজনের সোনার হার পরিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। নাটক দেখা তহমিনার একটা নেশা। প্রতি রবিবার ওরা নাটক দেখতে যায় কোনওদিন একাডেমিতে, কোনওদিন রবীন্দ্রসদনে কিংবা গিরিশমঞ্চে। গিরিশমঞ্চ তহমিনার প্রিয়। কারণ, নাটক শুরু হবার আগে অনেকক্ষণ গঙ্গার ধারে বসা যায়। একদিন বাগবাজারে সারদা মায়ের বাড়িতে গিয়ে সারাক্ষণ বসেছিল। সেদিন আর নাটক দেখা হয়নি। রাতে বাইরে খেয়ে বাড়ি ফেরা। হাসি আর আনন্দের মধ্যে কেটে যাচ্ছিল দিনগুলি।

এমন সময় একদিন তহমিনার এক চাচা এলেন দুর্গানগরের ভাড়া বাড়িতে। তহমিনা তো তাঁকে দেখে অবাক। অরিন্দমও বাড়িতে ছিল। তহমিনা বলল— চাচা, তুমি?

— কিরে, কেমন আছিস?

— ভালো। তোমরা?

— এই চলছে। বসতে বলবি না?

তহমিনা হতবাক্ হয়ে গেছে। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলল— হ্যাঁ, এসো এসো ঘরে এসো। কে এসেছে দেখো?

অরিন্দম বেরিয়ে আসে। তহমিনা পরিচয় করিয়ে দেয়— আমার ছোট চাচা। আব্বা, আম্মা কেমন আছে?

— ভালো।

— আর চাচী?

— সেও ভালোই আছে।

দু'জনে যত্ন করে বসায় তাকে। একথা সেকথার পর চাচা বলে—

শোনো তোমরা, যে জন্য আমি এসেছি। প্রথমে আমাদের একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। তবে এখন আমাদের পরিবারের সবাই তোমাদের বিয়ে মেনে নিয়েছে। তোমাদের বিয়ের ব্যাপারে আর আমাদের কোনও আপত্তি নেই। দাদা আমাকে পাঠিয়েছেন, তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যেতে। চলো বাড়িতে সবাই তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছেন। আজ রাতে দাদা আবার একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সব থাকবে। নাও তোমরা তৈরি হয়ে নাও।

— আজকেই? দু'একদিন পরে গেলে হয় না— তহমিনা বলল।

চাচা তাড়া দেন— নারে, তোদের দেখার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। তোর আম্মা আর চাচী তো কেঁদে কেটে অস্থির। নে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। আমি একটা গাড়ি নিয়ে এসেছি। প্রথম মেয়ে-জামাই বাড়ি যাবে। বাড়ি গিয়ে তোদের গল্প শুনবো। বাবা যা একখানা খেল তোরা দেখালি। নাও নাও দেরি করো না।

— তোমার জন্য একটু চা অন্তত করি।

— তুই তো জানিস যে আমি চা বড় একটা পছন্দ করি না। তুই বরং নে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে।

— চাচা শোনে

তহমিনা চাচাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে — আচ্ছা ও গেলে ওর কোনও অসম্মান হবে না তো?

— তুই কী পাগল হয়ে গেলি তহমিনা? ও আমাদের জামাই, আমাদের বাড়িতে ওর অসম্মান হবে, এটা তুই ভাবলি কি করে? হ্যাঁ, তুই ওভাবে চলে আসাতে আমাদের একটু রাগ হয়েছিল বৈকি। তবে এখন ওই সব রাগটাগ জল হয়ে গেছে। নে চল্, নাও বাবাজী, তৈরি হয়ে নাও শ্বশুরবাড়িতে তোমার একপাল শালাশালি, ঠেলা সামলাতে অস্থির হতে হবে।

ভিতরের ঘরে গিয়ে তহমিনা অরিন্দমকে বলল— কী করবো?

— তুমি বলো।

— না, তুমি যা বলবে তাই।

— চলো একবার গিয়ে তো দেখি। অবস্থা বেগতিক দেখলে চলে আসবো।

— যাবে, বলছো?

— হ্যাঁ, চলো, শ্বশুরবাড়ির আদরটা খেয়ে আসি।

— যদি কিছু অসুবিধা হয়? যদি—

— আরে চলো তো, উনাকে তুমি কী করে না করবে বলো?

ওরা কিছুক্ষণের মধ্যে তৈরি হয়ে গাড়িতে উঠে গেল। ঘন্টা খানেকের মধ্যে ওরা পৌঁছে গেল ফতেপুরের রমজান আলির বাড়িতে। আদর আপ্যায়নের ত্রুটি ছিল না। প্রথমটায় অরিন্দমের মনেও একটু ভয় ছিল, কিন্তু ওদের ব্যবহারে তা কেটে গেল। ও বাড়িতে গিয়ে তহমিনাকে দু'একবারের বেশি দেখেনি অরিন্দম। সন্ধের দিকে ওদের কিছু আত্মীয়-স্বজন এলো, গালে দাড়ি, মাথায় টুপি বয়স্ক মানুষ সব। একটা বড় ঘরে সবাইকে বসতে দেওয়া হল। ওই ঘরে অরিন্দমকে নিয়ে এলেন শ্বশুর রমজান আলি। সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপরের যা বক্তব্য অরিন্দম তা কল্পনাও করতে পারেনি। রমজান আলি বললেন— বাবাজী, তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করেছ, প্রথমটায় আমাদের অমত থাকলেও এখন আমরা মেনে নিয়েছি। সবাই সমস্বরে বলে উঠল।

— আল্‌হামদুল্লিহ্..

— কিন্তু বাবাজী বিয়ে করলেই তো হলো না? একজন মুসলমান মেয়েকে তুমি তখনই বিয়ে করতে পারো, যখন তুমি নিজে মুসলমান হবে। আজ মুসলমান হবার পক্ষে একটা পবিত্র দিন। আমাদের মৌলবী সাহেব এসে গেছেন। উনি তোমাকে কলেমা পড়িয়ে মুসলমান করে নেবেন। প্রতিটি মুসলমান পুরুষের সুন্নত করা অপরিহার্য। খোন্দকার সাহেবও উপস্থিত আছেন উনি ওই কাজটি করবেন। এই দুটো কাজ হয়ে গেলে তোমাকে আমরা জামাই হিসাবে মেনে নেব।

—না, এ অসম্ভব। অরিন্দম বলে।

এই সময় হঠাৎ পাগলের মতো ছুটে আসে তহমিনা, চিৎকার করে বলে— না-না, ও এই কাজ কখনো করবে না। স্বামীর ধর্মই মেয়েদের ধর্ম। ওর ধর্মই আমার ধর্মও। কিছুতেই ধর্মান্তরিত হবে না ও। আর একজন বয়স্ক পুরুষের সুন্নত হলে সে বাঁচতে পারে না। ওকে তোমরা মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছ। আমরা এক্ষুনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

— এ এখানে কী করে এলো? একে এখান থেকে সরিয়ে নাও।

গর্জন করে উঠে রমজান আলি। কয়েকজন মিলে তহমিনাকে ধরে সরিয়ে নিতে যায়। হঠাৎ তাদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে অরিন্দম চিৎকার করে

বলে— খবরদার, কেউ ওর হায়ে হাত দেবে না। তোমরা ষড়যন্ত্র করে আমাদের এখানে এনেছ। আমরা এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

তহমিনার হাত ধরে বলে— চলো, এখানে আর নয়, ওরা বিশ্বাসঘাতক। চলো।

মুহূর্তের মধ্যে যেন হিংস্র হয়ে ওঠে উপস্থিত লোকগুলির একজন চেঁচিয়ে বলে— কোথায় যাবি রে কাফেরের বাচ্চা? বাঘের গুহায় পা দিয়েছিস। পালানো এত সহজ! এই তহমিনাকে নিয়ে যা, ঘরে তালাবন্ধ করে রাখ্।

— না আমি যাবো না। ও—কে তোমরা ছেড়ে দাও। আমরা চিরদিনের মতো চলে যাব, আমাদের যেতে দাও।

— তুই ঘরে যা তহমিনা, এই কাফেরের বাচ্চাটাকে কবরে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। এই তোরা দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? নিয়ে যা ওকে। সলিমউদ্দিন চিৎকার করে উঠে, সে এ পাড়ার মাতব্বর।

কয়েকজন মিলে জোর করে ধরে নিয়ে যায় তহমিনাকে। অরিন্দম ছুটে গিয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করে। তাকেও কয়েকজন ধরে ফেলে। মাতব্বর বলে— কাফেরের বাচ্চার তেজ দেখেছ? শালা তোর ব্যবস্থা করছি। তুই শালা আমাদের সমাজের, পাড়ার মুখে চুন-কালি দিয়েছিস। এই ডিব্বাটা কোথায় রে?

একজন একটি কেরোসিন ভর্তি জার এগিয়ে দেয়— এই যে।

— দে শালার গায়ে ঢেলে দে। কয়েকজন অরিন্দমের হাত ধরে রাখে। একজন সারা গায়ে কেরোসিন ঢেলে

দেয়।

— যা শালা জাহান্নামে।

বলে মাতব্বর তার গায়ে একটি দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি ছুঁড়ে দেয়। সারা দেহ জ্বলতে শুরু করে অরিন্দমের। ছাড়া পেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো রাস্তা দিয়ে ছুটতে থাকে। পেছনে মারমুখো মানুষগুলো। নিজেদের গ্রামের সীমানায় এসে তারা থমকে দাঁড়ায়। জ্বলন্ত মানুষটি তখনও ছুটছে।

পুলিশ অরিন্দমের জবানবন্দি নিয়ে চলে গেল।

চিকিৎসায় ভালো সাড়া দিচ্ছে অরিন্দম। ওদিকে তহমিনার বাবা, চাচা সহ কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পঞ্চম একটি মাঝারি খবরের কাগজের জেলা সংবাদদাতা। সে একটা ফিচার করে খবরটি দপ্তরে পাঠিয়েছিল। সম্পাদক তাকে ডেকে বললেন— তুমি কী করে ভাবলে যে এরকম একটা খবর আমাদের কাগজে ছাপা হবে? দপ্তরে ভাঙচুর হলে দায়িত্বটা তুমি নেবে?

এই খবরটি নিয়ে অনেক কাগজ আর ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার দরজায় দরজায় ঘুরেছে পঞ্চম। কিন্তু সবাই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, কেউ এগিয়ে আসেনি। কলকাতার একটা জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদটি যোগাড় করে ছেপেছিল। অথচ কিছুদিন আগে প্রায় একই রকম রিজওয়ানুর রহমানের ঘটনায় কলকাতা তো বটেই সারা দেশের প্রচার মাধ্যম ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কতজনের চাকরি গেল, কতজনকে জেল খাটতে হলো। অবশেষে অরিন্দম প্রায় সুস্থ হয়ে উঠলো, একদিন তহমিনা এসে তাকে ছুটি করিয়ে নিয়ে গেল। ওরা কোথায় গেল কেউ জানে না। পুলিশ কেসের আসামীরাও একে একে ছাড়া পেয়ে গেল। এতবড় একটা ঘটনা প্রায় নিঃশব্দে বিলীন হয়ে গেল। পঞ্চম এখনও ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। □

॥ মহর্ষির প্রার্থনা ॥

হে পরমাত্মন্। আমাদের এই বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল কর। তোমার এইসকল দুর্বল সন্তানের প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান কর। এই হীন পরাধীন দেশের আর কেহই সহায় নাই— ইহা নানা ক্লেশ নানা বিপত্তিতে দিন দিন আবৃত হইতেছে— দিনরাত্রি ইহার ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তুমি এদেশকে উদ্ধার কর।

—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

A WELL WISHER

BARASAT
N/2, KNC Road, 1st Floor, Haritala,
Kolkata - 700 124, W.B.
Ph. 2562-7639, 2584-2596,
(M) 9433381949
E-mail :
leesun.college@gmail.com

KRISHNANAGAR
16/1, T. D. Banerjee Road
Near Saktinagar Hospital
Dt. Nadia, West Bangal
Krishnanagar-741101
P. 9233620850, 9735342382
e-mail :
leesun.college3@gmail.com

BERHAMPORE
Gorabazar (Opp. Town Club)
Murshidabad, W.B.
Ph. (03482-320161)
9732725748
9874089945

সূর্য মন্দির ও কুণ্ড

মধেরার সূর্য মন্দির

সৌমেন নিয়োগী

বিশ্ব মানব সভ্যতায় মানুষের বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক উন্মেষের ঊষালগ্নে ভারতীয় মনীষার শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই, তার বিশ্ব অপার ব্রাহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত পৃথিবী নামক গ্রহে প্রাণের স্ফূরণ ও বিকাশের জন্য যে সকল শক্তি নিহিত, তাদের প্রতি ভক্তিতে ও শ্রদ্ধায় সুউচ্চ প্রশংসা প্রেরণ করা যা বিভিন্ন বৈদিক শ্লোকে ঋষির দিব্য দৃষ্টিতে প্রতিভাত। সূর্যউপাসনা কোনও জড় অগ্নিপিণ্ডের উপাসনা নয়। তেজশক্তিরূপ সূর্যাগ্নি সকল প্রাণের উৎস। প্রাণময় সর্বেশ্বর ব্রহ্ম সৃষ্টির স্থিতি ও লয়ের কর্তা। ভারতীয় ঋষিরা তাঁদের প্রজ্ঞা ও দৈব দিব্যদৃষ্টিতে অত্যুজ্জ্বল তেজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন সেই হিরন্ময় পুরুষের, যিনি সূর্যের অন্তরস্থ পুরুষ— যিনি সর্বচেতনার উৎস।

উত্তর গুজরাটের মেহেসানা জেলার অন্তর্ভুক্ত পুষ্পবতী নদীর তটস্থ সহস্রাব্দ প্রাচীন সোলাঙ্কিয় বংশীয় চালুক্যিয় রাজাদের হাতে নির্মিত স্থাপত্য ভাস্কর্যের সমৃদ্ধ সূর্যমন্দির সেই অন্তর্নিহিত ব্রহ্মাণ্ডের চালিকাশক্তির প্রতি ভারতীয় মননের এক অনবদ্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, যা নিখিল বিশ্বের মানুষ, উদ্ভিদ ও সকল প্রাণী সমূহের মধ্যে অবস্থিত সেই হিরন্ময় পুরুষের উদ্দেশে এক সার্থক নয়ন বিস্মিতকারী সৌধ।

প্রাচীনকালে মধেরা, মধেরাপুরা বা মুন্দেরা নামে পরিচিত ছিল এবং কেউ কেউ মনে করেন যে এই স্থানটি আসলে মোধা ব্রাহ্মণদের নিবাস ছিল এবং পৌরাণিক উপাখ্যান অনুসারে রাম-সীতার বিবাহের উপঢৌকন হিসাবে মোধা ব্রাহ্মণদের এই শহরটি উপহার রূপে দেওয়া হয়।

সূর্য উপাসনা পৃথিবীর নানা দেশে প্রচলিত ছিল নানা নামে, নানা আকারে। যেমন গ্রীক দেশে হেলিয়স, ল্যাটিনদের সোল, টিউটনদের টার, ইরানীয়দের খরসেদ, জাপানে নিতেন, মিশর দেশে খাপ্রি ইত্যাদি। ভারতবর্ষে হিন্দু জাতির মধ্যে যে প্রধান পাঁচটি শ্রেণীর উপাসনার স্থান বা মন্দির আছে, তাদের মধ্যে সূর্য উপাসনা অন্যতম এবং সূর্য উপাসনার যে ব্যাপ্তি ও জনপ্রিয়তা এই প্রাচীন দেশে সমাদৃত সুদুর অতীত থেকে, তার প্রমাণ কাশ্মীরের অবন্তিপুরে মার্তণ্ড সূর্যমন্দির ও ওড়িশার কোণারকের সূর্য মন্দির।

বিশিষ্ট পর্যটক হিউয়েন সাং খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর ও আলবেরুনীর খৃষ্টীয় এগারো শতাব্দীর ভ্রমণ সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, মুলতান প্রদেশে ও সুবিখ্যাত সূর্যমন্দিরও সূর্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত

ছিল।

ভবিষ্য, শাম্ব, বরাহ প্রভৃতি পুরাণে কৃষ্ণপুত্র সাম্ব কর্তৃক কুষ্ঠ রোগ মুক্তির আশায় সূর্য উপাসনা প্রবর্তনের কাহিনী বর্ণিত আছে। সুপ্রাচীনকালে ভারতের সূর্য প্রতীকি উপাসনা প্রচলিত ছিল যেমন গোলক, পদ্ম, চক্র ইত্যাদি। সুতরাং মধেরায় এক হাজার সাতাশ খৃষ্টাব্দে সোলাঙ্কিয় রাজ্য বংশীয় চালুক্যরাজ প্রথম ভীমদেবের হাতে নির্মিত মধেরার এই সূর্য মন্দির ভারতবর্ষের আবহমানকাল ধরে চলে আসা সূর্য উপাসনার একটি অভূতপূর্ব নিদর্শন স্বরূপ।

ভবিষ্যপুরাণ অনুসারে কৃষ্ণপুত্র শাম্ব কুষ্ঠ রোগ নিবারণের জন্য শক দ্বীপ থেকে মগ ব্রাহ্মণদের এনে সূর্যের পূজা করিয়েছিলেন। সংস্কৃত 'মগ' শব্দ পার্শী ম্যার্গি শব্দ থেকে এসেছে। সুতরাং শক দ্বীপ থেকে আবির্ভূত মগ ব্রাহ্মণরাই অথবা দেবগ্য ব্রাহ্মণরাই ভারতবর্ষে নতুন করে সূর্যের পূজা আনেন এবং উত্তর গুজরাটের এই প্রদেশটি পুরাণে ধর্ম অরণ্য ক্ষেত্র হিসেবে খুবই উচ্চভাবে প্রশংসিত। মধেরার সূর্য মন্দিরটি আজও একটি সুবৃহৎ শিল্প সুসময় সজ্জিত এক অনন্য কৃষ্টির প্রতীক।

চারুকলা বা শিল্পকর্ম জীবনেরই এক দর্পণ। যে দর্পণ ইতিহাস ও ঘটনাপঞ্জীর থেকেও সত্যকে বেশিভাবে উন্মোচনে সক্ষম। ঐশ্বরীয় সেই অতি প্রাকৃতিক মহাজাগতিক সত্যকে কীভাবে শিল্পী ও বিভিন্ন প্রকার স্থপতিকারেরা ভাবাবেগের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাণহীন নীরব পাথরকে খোদাই করে কেটে অনাবৃত করেছেন তাদের কৃষ্টিকে, যেখানে স্থাপত্যের নৈপুণ্যতায় আবদ্ধ হয়ে বিজয়ী হয়েছে শিল্পের সাফল্য। যখন সূর্য কুণ্ড, সভামণ্ডপ, গূঢ়মণ্ডপ এবং সর্বোপরি গর্ভগৃহ দ্বারা মন্দিরটি পূর্ণতা অর্জন করেছে।

১৭৫ ফুট বাই ১২০ ফুট আনুমানিক আকারে সভামণ্ডপের পূব'দিকে জ্যামিতিক আকারে শোভিত একটি আয়তাকার জলের পুষ্করণী যাকে সূর্যকুণ্ড বা রামাকুণ্ড বলা হয়, মধেরার সূর্যমন্দিরে পূর্বদিক সংলগ্ন ধাপে ধাপে পিরামিড আকৃতির ছোট ছোট সিঁড়ির দ্বারা বেলে পাথরের এই জলের কূপটি কোনওরকম চুণ-বালি ও জলের মিশ্রণ ছাড়াই পাথরের সঙ্গে পাথরকে জুড়ে নির্মিত। এই সূর্যকুণ্ডটি জলস্তর অবধি নামতে তার চতুষ্কোণ ও পরিধি বিভিন্ন ছোট বড় মোট ১০৮টি দেব-দেবীর মূর্তি দ্বারা ভূষিত, এর অর্থ সূর্য উপাসনার পূর্বে শরণার্থী ও পুণ্যার্থিগণ এই কুণ্ডের জলে নিজেদের পরিশুদ্ধ করে নিতে পারবে, ১০৮টি রুদ্রমালায় যেরূপ রূদ্রাক্ষ থাকে সেইভাবে নিজেদের সূচিতা বৃদ্ধির ও ধর্মীয় ভাবাবেগকে আরও দৃঢ় করতে সক্ষম হবেন।

পৃথিবী যেহেতু তার আপন অক্ষে পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘোরে, ফলে আমরা পৃথিবীতে অধিষ্ঠ জীব সূর্য উদয়কে পূর্বদিক থেকেই অনুধাবন করে থাকি। ফলে উদিত সূর্যের রশ্মি সর্বপ্রথম গর্ভ গূঢ় মণ্ডপের মধ্যে অবস্থিত, গর্ভগৃহে অধিষ্ঠিত সূর্যমূর্তিকে চয়ন করে সভামণ্ডপের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত পূর্বদিক থেকে আগত সূর্য রশ্মি। সুতরাং এহেন সভামণ্ডপ নির্মাণের পিছনে জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল। সূর্যকুণ্ড থেকে সভামণ্ডপের প্রবেশের মধ্যে রয়েছে সুউচ্চ দুটি কীর্তি স্তম্ভ। সেই স্তম্ভ দুটির উপরের খিলান অবশ্য লুপ্ত।

সূর্যকুণ্ড থেকে উপরে উঠে আমরা কীর্তিস্তম্ভকে অতিক্রম করে এই সভামণ্ডপ বা নৃত্যমণ্ডপে প্রবেশ করে তার শিল্পীয় বিশালতা দেখে সত্যি বিস্মৃত হই। বাহান্নটি স্তম্ভ দ্বারা নির্মিত অর্থাৎ একটি বছরের বাহান্ন সপ্তাহকে নির্ধারণকারী এই স্তম্ভগুলি শিল্প মাধুর্যে পরিপূর্ণ, প্রবেশ থেকে শুরু করে চারযুগল স্তম্ভের সমান্তরাল সারি মণ্ডপের কেন্দ্রে এসে এক অষ্টভূজাকীর্তির তল নির্মাণ করেছে, যার উপরে কেন্দ্রস্থ হয়ে রয়েছে একটি অতিকায় গম্বুজ এবং এই সভামণ্ডপের গম্বুজের শিল্পসুষমাটি একটি পদ্মের পাতার বিন্যাসের আকারে সজ্জিত, যাকে বলে পদ্মশীলা। সভাপণ্ডপের স্তম্ভগুলি বিভিন্ন প্রতিমার মূর্তির দ্বারা অলংকৃত। পিলারগুলির পূর্বদিকগুলি দ্বারপালের মূর্তির দ্বারা আবৃত। এছাড়াও বৈষ্ণব, শৈব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মূর্তি রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদির দৃশ্যে অলংকৃত। শিল্পশাস্ত্র এবং বাস্তুশাস্ত্রের এক অভিনব মেলবন্ধন।

আটটি প্রধান স্তম্ভের দ্বারা নির্মিত অষ্টভুজ আকৃতির দ্বারা বিন্নস্ত্য এবং আরও চারটি স্তম্ভ দ্বারা বেষ্ঠিত সমকেন্দ্রিক বেষ্টনের দ্বারা মূল গুপমণ্ডপ গম্বুজটি শোভিত। একটি ছোট্ট অন্তরালের দ্বারা গর্ভগৃহটিকে পৃথকীকরণ করা হয়েছে। এই গর্ভগৃহে উপাস্য সূর্যের মূর্তিটির চরণযুগলকে স্পর্শ করত পূর্ব দিক থেকে উদিত সূর্যের প্রথম রশ্মি, যা কৃতি তোরণের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে সভামণ্ডপকে অতিক্রম করে মূল গর্ভগৃহে প্রবেশ করত। আজও বিষুব (Equinox) সময়কালে এই ঘটনাটি সত্য। গূঢ় মণ্ডপটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। আনুমানিক ৫ ফুট উচ্চ অনলাংকৃত পিঠ, আনুমানিক ১১ ফুট উচ্চ মন্দদ্বার এবং গম্বুজ, যেটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। গম্বুজ সহ শিখরাবিশিষ্ট মন্দিরটির ভগ্ন রূপের অনেকগুলি কারণের মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ প্রচণ্ড ভূমিকম্প, বেলে মাটিগুলির প্রাকৃতিক কারণে বাস্তু ও জলের দ্বারা ক্ষয় এবং সর্বোপরি প্রতিমা ধ্বংসকারী মন্দির লুণ্ঠনকারীদের আক্রমণ। গূঢ়মণ্ডপের বহির্দেওয়ালগুলি অর্থাৎ মন্দদ্বার সূর্যের বারোটি রূপ অর্থাৎ বারো আদিত্য এবং অষ্টদিক পালের দ্বারা শোভিত। এমনকি ভিতরের কক্ষগুলিতেও বারোটি আদিত্যের মূর্তি দণ্ডায়মান। মন্দদ্বারে বেলে পাথরের খোদিত সূর্যমূর্তিগুলি সাতটি অশ্ব দ্বারা চালিত রথের উপরে দণ্ডায়মান। পুরাণে সূর্যের সাতটি রশ্মির নাম পৃথক পৃথক ভাবে উল্লিখিত হয়েছে—

''সুষুম্নো হরি কেশশ্চ বিশ্বকর্মা তথৈব চ।
বিশ্বশ্রবাঃ পুনশ্চান্যঃ সংযদ্বসুরতঃ পরঃ।।
অর্বাবসুরিতিখ্যাতঃ স্বরকঃ সপ্তকীর্তি তাঃ।।
—সূর্যের সাতটি রশ্মির নাম সুষুম্ন, হরিকেশ, বিশ্বকর্মা,

বিশ্বশ্রবা, সংযদ্বসু, অর্বাবসু ও স্বরক।

ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সূর্যের সপ্ত অশ্ব বা সপ্ত রশ্মি সম্পর্কে লিখেছেন, 'সূর্যের সপ্ত তুরগ তাহার সপ্ত রশ্মির প্রতীক হিসাবে কল্পিত হইয়াছিল। অধুনা বিজ্ঞানমতে সূর্য রশ্মি বিশ্লেষণ করিয়া সাতটি রঙ দেখা গিয়াছে। এই সাতবর্ণের সাতটি রশ্মিকে সংক্ষেপে Vibgyor বলা হয়। সহস্র বৎসর পূর্বে হিন্দু, বৌদ্ধদের এই সপ্তরশ্মি বিশ্লেষণ করা কম কৃতিত্বের কথা নহে। এতদিন উহা কুসংস্কার বলিয়া চলিত। এখন সেই পুরাতন কুসংস্কার বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে।'

মধেরার সূর্য মন্দিরে বারোটি সূর্য দেবের মূর্তি আছে যা বারোটি আদিত্যের প্রতীক এবং বারোটি মাসের বছরের এক একটি মাসের প্রতীক স্বরূপ। এই বারোটি আদিত্য যথাক্রমে (১) ধত্রী (২) মিত্র (৩) আর্যমন (৪) রুদ্র (৫) বরুণ (৬) সূর্য (৭) ভাগা (৮) বিভস্মভান (৯) পূষাণ (১০) সাবিত্রী (১১) ত্রভস্তি (১২) বিষ্ণু।

মধেরার সূর্য মন্দিরের বিগ্রহ

সূর্য বৈদিক দেবতা এবং ভারতবর্ষের প্রধান উপাস্য দেবতাদের মধ্যে একজন হওয়া সত্ত্বেও সূর্য উপাসনার ক্ষেত্রে সূর্য মূর্তি নির্মাণের পরবর্তীকালে বিদেশী প্রভাব কার্যকর রূপ নিয়েছে যা মধেরার মন্দিরে সূর্যদেবের মূর্তির মধ্যে প্রতিভাত। অর্থাৎ শকদ্বীপের মগ ব্রাহ্মণদের প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে। সূর্য মূর্তিগুলির মধ্যে ইরানীয় শিল্প ভাবনার যথেষ্টভাবে লক্ষণীয় যেমন পরনে হাঁটু পর্যন্ত মোজা বা জুতো মাথায় ইরানীয় টুপি এবং গায়ে আঙরাখা।

ভারতীয় মন্দির নির্মাণের ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে প্রেম মাধুর্যের যে আপাত বিরোধী সত্য, মধেরার মন্দিরে প্রেম সংক্রান্ত শিল্পকলা দেখে আমরা আশ্চর্য হই। খাজুরাহো, কোণারক ও ভুবনেশ্বর ইত্যাদি মধ্যযুগের মন্দিরের গায়ে এইরূপ কাম ও যৌন ও মিথুন মূর্তিগুলি দেখে স্বভাবতই মনে সংকোচের উদ্ভাবনা হয়। যেখানে আমাদের শাস্ত্রে তাপস, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস এবং মোক্ষের কথা বারবার করে বলা হয়েছে। আসলে এই মিথুন মূর্তির দ্বারা মনুষ্য জীবনে যে পাঁচ রিপু ক্রিয়াশীল তার মধ্যে কামকে প্রকাশ্যে পতিত করা হয়েছে এক পরম সুখ নিধানকারী রূপে। আমাদের একথা ভুললে চলবে না, আমরা ধরিত্রীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করি উর্বরতার প্রতিকীরূপে এবং এই উর্বরতাই জীবন, সমস্ত প্রাণীকুলে তাই উর্বরতার ফলে যেমন বংশ এবং বিভিন্ন প্রজাতির বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ মন্দিরের গায়ে এইরূপ মৈথুনরত বিভিন্ন মূর্তিগুলি সে যুগে মনুষ্য প্রজাতির কাছ একটি উর্বরতা প্রেরক রূপী দোহকের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, কারণ জীবনের অর্থই হচ্ছে সম্প্রসারণ। সংকোচনের অর্থ মৃত্যু। সেই মৃত্যুকে এবং অশুভ শক্তিকে অতিক্রম করার একমাত্র শুভ লক্ষণ হল উর্বরতা।

সেই উর্বরতা যাতে সুবৃদ্ধি হয় এবং মনুষ্য সভ্যতার যেন বিলুপ্তির পথে না যায়, সেই প্রবাহকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই বিভিন্ন কামসূত্রগুলি শিল্প নৈপুণ্যের দ্বারা বাস্তু শাস্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রেখে মন্দির গাত্রে প্রতিভাত করা হয়েছে।

কোনও শিল্পী তার জীবনে সমাজকে অবজ্ঞা করতে পারে না এবং সেই সামাজিক জীবন তার শিল্পকলার বিকাশে মূল উৎস, তাই জীবনের সমস্ত কিছুই যা আমাদের সামাজিক জীবনে ঘটে চলেছে, তা একজন শিল্পী তার চারুকলার ইত্যাদির দ্বারা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম, অর্থাৎ "Beauty is truth and truth is beauty"।

তাই সোলাঙ্কি রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সে যুগের শিল্পীরা কেবল এই মন্দির নির্মাণের কাজ করেননি, তাঁরা সেই সময়কার সভ্যতার দূত রূপে নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন, যা আমরা বর্তমান শতাব্দীতেও উপলব্ধি করতে অক্ষম। □

ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে
"চিকিৎসার জন্য দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ব্যধিমুক্তি"—রীণা দেবনাথ

সুদূর হুগলী জেলার কোন্নগরের এক গৃহবধূ—রীণা দেবনাথ। বছর ৪০-এর রীণা দেবী মারাত্মক চর্মরোগের শিকার হয়েছিলেন। খুবই কষ্ট পেতেন। সারা শরীর ফুলে ফুলে যেত, প্রচণ্ড চুলকাতো। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। এভাবেই কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। হঠাৎ-ই রীণা দেবী তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের নাম শুনলেন। জটিল এ্যালার্জী রোগী রীণা দেবী বিস্তারিত সব জেনে ২/১ দিনের মধ্যে চলে এলেন—হুগলীর কোন্নগর থেকে উত্তর ২৪ পরগণা মণ্ডলপাড়ায় ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে। রোগ যন্ত্রণায় বিব্রত ও দিশাহারা রীণা দেবনাথ হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগণার দূরত্ব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মূল ব্যাপার ছিল রোগমুক্তি এবং এজন্য তিনি যে কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। যাই হোক— রীণা দেবী ডাঃ মন্ডলকে তাঁর রোগের সবিস্তৃত বর্ণনা দিলেন ও ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডল, অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনলেন এবং সেদিন থেকেই শুরু হলো—রীণা দেবীর চিকিৎসা। রীণা দেবীও আস্থা ও ধৈর্য নিয়ে ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হবার দিকে এগোতে লাগলেন। সামান্য কয়েক মাসের চিকিৎসায় কোন্নগরের গৃহবধূ রীণা দেবনাথ আজ সুস্থ ও ভালো আছেন। দূর-দূরান্তে এমনও অনেক কঠিন ও জটিল রোগাক্রান্তরা আছেন যাঁরা মনে ভাবেন যে, ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের হোমিও চেম্বার অনেক দূরে কিন্তু কোন্নগরের রীণা দেবনাথ, এটা দেখিয়ে দিলেন যে, রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে দূরত্বটা কখনই বড় ব্যাপার হতে পারে না।

রীণা দেবীর মাধ্যমে কোন্নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের একটা ব্যাপক প্রচার হয়েছে। এবং পরিচিত, অপরিচিত অনেকের কাছেই তিনি ডাঃ মন্ডলের অসাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেন ও ডাঃ তরুণ মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আজ রীণা দেবী। *উপকৃত রোগী কর্তৃক প্রচারিত।*

যোগাযোগ ঃ হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস **"ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—**

B.H.M.S. (Cal.),FW.T., P.E.T."

কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

চেম্বার ঃ চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা–

(সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।

বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।

দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।

মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬

ডি-লা-গ্র্যান্ডি দাদাগিরি ইয়াক্ ইয়াক্

বাংলা সাহিত্যে দাদার অভাব নেই। কন্দুক লাগলেও বন্দুক-টন্দুক লাগেনি। টেনিদা, ঘনাদা, ব্রজদা, নোলেদারা মুখে মুখেই দাদাগিরি করে গেছেন। আর তাদের সেই কীর্তি নিয়ে গবেষণা করেছেন একালের ফনেদা। সব দাদার সঙ্গ পাওয়া ফনেদার কাছে জমা আছে দাদাদের ঠিকুজি কুষ্ঠি। ফাঁস করলেন **পিনাকপাণি ঘোষ।**

বঙ্কা, টনি, বুজু আর পিনে। আমরা চার বন্ধু। যাকে বলে হরিহর আত্মা। বৈশাখের বিকেল। বোস পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটে বসে আম-মাখা খাচ্ছি আর জোর তর্ক চলছে। বিষয় আই পি এল। বঙ্কা আর টনির দাবি, সৌরভ গাঙ্গুলির মতো ক্যাপ্টেন হয় না। আর বুজু একা ধোনির ফেভারে। আমি নিরপেক্ষ। আম-মাখার বাটিতেই যত পক্ষপাত। আলোচনাতেই বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারির বন্যা। এমন সময় ফনেদা উপস্থিত। উপস্থিত না বলে সেটাকে আবির্ভাব বলাই ভাল। ইয়া লম্বা হাত বাড়িয়ে চড়াৎ করে এক খাবলা আম-মাখা তুলে নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন,

কীরে পিনে, কী এত গলাবাজি চলছে র‍্যা? সেই পুকুরের ওপার থেকে তোদের গলার বাজি ফাটার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আমি বললাম, ওই ক্রিকেট নিয়ে কথা হচ্ছিল। বুজু ধোনির...। বাক্যটা শেষ হল না, ফনেদা দাবড়ে বললেন, বুজু আবার ধ্বনি কী দেবে? এমনিতেই তো ওর গলা চড়াই পাখির মতো চিঁ চিঁ করে।

চড়াই-টড়াই নয়, বুজু বাজপাখির মতো চিল্লিয়ে বলল, না, না। মোটেই সেই ধ্বনি নয়, আমি ক্রিকেট প্লেয়ার ধোনির কথা বলছি।

কী? তোরা এই ইরিং, বিরিং, তিরিংয়ের দল ক্রিকেট নিয়ে কথা বলছিস? তোদের আস্পর্ধা তো কম নয়। কী জানিস ক্রিকেট নিয়ে, অ্যাঁ? বাইশ গজে দাদাগিরি করা বাঙালি দাদার নাম জানিস?

সুযোগ পেয়েই বঙ্কা আর টনি একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, জানি জানি সৌরভ গাঙ্গুলি।

চোপড়াও। ফনেদা'র ধমকে যেন কড়াক্কড় শব্দে বজ্রপাত হল। সৌরভ গাঙ্গুলি! একটা বলে দিলেই হল! ক্রিকেটটা ডাংগুলি খেলা নয়। সাহেবদের খেলা। আর সেই খেলায় সর্বপ্রথম ইংরেজ সাহেবদের চোখে সর্ষে ফুল চাষ করেছিলেন ব্রজদা। একমেবদ্বিতীয়ম ব্রজদা। শ্রীশ্রী ব্রজরাজ কারফর্মা।

শুনেই তো আমাদের চোখে শুধু সর্ষে ফুল নয়, জোড়া জোড়া বিস্ময়সূচক চিহ্ন। ব্রজদাটা আবার কে? সেদিকে না তাকিয়েই ফনেদা শুরু করে দিলেন তাঁর ব্রজদার গল্প।

সে গল্প শোনার আগে যাঁরা ফনেদাকে চেনেন না, তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা জরুরি। পুরো নাম ফণিভূষণ চাকলাদার। তবে আমরা সেটাই জানি। কারণ, ভোটার আই কার্ড বা অন্য কোনও পরিচয়পত্র দেখিনি। শুনেছি, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নাম তাঁর। যুগে যুগে, কালে কালে বদলায় নাম। তিনি যতটা রোগা, ততটাই লম্বা। হাতগুলো আরও বেশি লম্বা। ফনেদা বলেন, শ্রীচৈতন্যের পরই দীর্ঘতম হাত নাকি তাঁর। তাও মাত্র আড়াই সূতো কম। ফনেদা কী করেন? সেটা প্লিজ জানতে চাইবেন না। আমার পক্ষে সেটা বলা সম্ভব নয়। বরং কী কী করেন না বা করেননি, সেটা জানতে চাইলে চেষ্টা করা যেতে পারে। এমনকি তাঁর ঠিকানারও ঠিক নেই। তিনি বলেন, 'কেয়ার অফ গেছো দাদা।' ফনেদা সম্পর্কে একেবারে সবটা বলা সম্ভব নয়। পরে একটু একটু করে জানতে পারবেন। তবে একটা বিষয় বলে রাখি, ফনেদাকে আড়ালে আমরা গোঃ-গবৌ-গবাঃ বলে ডাকি। আসলে ফনেদা গবেষণা করেন। ওটাই তাঁর মূল পেশা বলে তিনি দাবি করেন। ফনেদাই বলেন, গবেষণা মানে গরু খোঁজা। গো অন্বেষণ। তাই ওই নাম। তবে সামনে বলে ফেললে আর আস্ত রাখবেন না। আছাড় মেরে আচার বানিয়ে দেবেন। সে যাই হোক, টবে কাঁঠাল চাষ থেকে চাঁদে বরফ কল বসানো সব বিষয়েই তিনি গবেষণা করেছেন। বাড়ির জানলা দিয়ে বান্ডিল বান্ডিল কাগজ দেখেছি। কিন্তু কাউকে ছুঁতেও দেন না। সেসবে নাকি শিহরণ জাগানো সব গবেষণাপত্র ঠাসা আছে।

যাই হোক, সেদিন আমাদের ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা ডকে উঠল। ফনেদা শুরু করলেন তাঁর দাদাদের দাদাগিরির কাহিনী। সেসব নাকি লেখাও আছে, ছাপাও আছে। আমরা কূপমণ্ডুক তাই পড়িনি।

আমাদের বিস্ময়সূচক চোখগুলোকেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন ফনেদা, শুনিসনি ব্রজরাজ কারফর্মার নাম?

আমাদের নির্বাক ঘাড় নাড়া দেখে গম্ভীর মুখে বললেন, এজন্যই বাঙালির কিছু হল না।

আফশোসের গলায় আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করতে লাগলেন, সত্য বাংলাদেশে চিরকালই উপেক্ষিত। আত্মশ্লাঘা নেই। বাঙালি নিজের ইতিহাসকে কোনওদিন মর্যাদা দিতে শেখেনি। তাই ব্রজদাকে চিনতে পারল না। এতে ব্রজদার বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি। যে ব্রজদা তিনি সে ব্রজদাই আছেন। মাঝখান থেকে বাঙালির ইতিহাসটাই পঙ্গু হয়ে গেল।

আমরা চার বন্ধু চুপ। হঠাৎ আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ফনেদা রকেটের মতো একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন, পিনে বলতো তোর ঠাকুরদার ঠাকুরদার নাম কী?

আমি মাথা চুলকোচ্ছি দেখেই হাসতে হাসতে ঘাড় নাচালেন, পারলিনে তো। জানতাম পারবি না। এবার বলতো দেখি শাজাহানের ঠাকুরদার ঠাকুরদার নাম কী?

একটু ভেবেই আমি বলে দিলাম, এতো সোজা। বাবর।

জানতাম পারবি। এটাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দোষ। পরের চোদ্দগুষ্টির নাম মুখস্থ। নিজেরটা বলতে গেলেই ব্রহ্মতালুতে মরুভূমি। একেবারে উট চরছে। ব্রজরাজ কারফর্মা কে জানিস? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি— এই চার যুগে পরশুরাম, হনুমান, অশ্বত্থামা, নানাসাহেব এবং ব্রজদা অমর। আবার এনাদের মধ্যে ব্রজদা, একমাত্র ব্রজদাই পঞ্চম যুগ অর্থাৎ আণবিক যুগ সাঁতরে পার হবার ক্যাপাসিটি রাখেন। একথা

বলে গেছেন স্বয়ং ব্রজদার জীবনের শ্রুতিলেখক। রূপদর্শী। মনে রাখবি, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের যেমন শ্রীম, ডাঃ জনসনের যেমন বসওয়েল, ব্রজদার তেমনি রূপদর্শী। বাংলা ভাষায় অমর সৃষ্টি হিসেবে তিনি ব্রজদার খান বিশেক গুল্প লিখে রেখে গেছেন। রূপদর্শীর কথায় গুল্প = গুল + গল্প। অর্থাৎ নির্ভেজাল সত্যি ঘটনা। যার মধ্যে ধরা আছে বাঙালির ইতিহাসের এক গৌরবজনক অধ্যায়।

বলতে বলতে ফনেদা দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন। শুধু আমরা নয়। বোস পুকুরের জলও স্থির হয়ে আছে। ভাবছি জিজ্ঞেস করি, কে এই ব্রজদা? কী কী লীলা দেখিয়েছেন তিনি?

ফনেদা যেন মনের কথা পড়ে নিলেন। বললেন, ভাবছিস তো কী করেছেন তিনি? বরং ভাব কী করেননি তিনি? ব্রজদা যে সে লোক নয়। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ব্রজদার পরামর্শে। অন্নদাশঙ্কর রায়কে বাংলা শিখিয়েছে কে? দেশবন্ধুকে কলকাতার মেয়র, শ্রীনেহরুকে ভারতের প্রাইম মিনিস্টার, গান্ধীজীকে মহাত্মা করল কে? সত্যেন বোসকে আইনস্টাইনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল কে? ব্রজরাজ কারফর্মা। আমার অনেক দাদার এক দাদা।

আপনার আরও দ্দাআদা আছে? রীতিমতো তুতলে গিয়ে প্রশ্ন করল বুজু।

আমার দাদা কি আর একটা নাকি! অনেক দাদা। আর তারা সকলেই এক একজন ইয়ে। ক্রিকেট, ফুটবল থেকে গোয়েন্দাগিরি সবেতেই তারা এক একটা ইয়ে। শুধু পপুলার নয়, ফেমাস। ব্রজদা, ঘনাদা, টেনিদা, নোলেদা, পিন্‌ডিদা। এক সে বড়কর এক। ওদের নিয়ে আমার একটা গবেষণাপত্রও আছে। তাতে অবশ্য সামান্যই আলোকপাত করা আছে। তবে সেখানে ফেলুদা, ঋজুদার কথা নেই। সেসব কাহিনী জানতে হলে মানিকদা মানে তোদের সত্যজিৎ রায় কিংবা বুধুদার বই পড়ে নিস। বুধুদা কে জানিস তো! গৌতম বুদ্ধ আর বুদ্ধদেব গুহ দু'জনকেই তো আমি ওই নামেই ডাকি কিনা।

তাই নাকি! সমস্বরে বলে উঠি আমরা। বঙ্কার চোখ দুটো তো ফুটবলের মতো গোল গোল।

আচমকাই আড্ডা ছেড়ে উঠতে উঠতে ফনেদা বললেন, যাক সেসব শুনে তোরা কী করবি। আমি বরং উঠি। কাল সকালে আবার পলাশী যেতে হবে।

হঠাৎ পলাশী কেন? জিজ্ঞেস করি আমি।

আর বলিস না। পলাশীর যুদ্ধে আম বাগানের ভূমিকা নিয়ে একটা গবেষণা করছি কিনা। তোরা মানে এই বাঙালি তো আর ঘরের খবর রাখে না। কিন্তু সাহেবরা আমার নাড়ি নক্ষত্র নজরে রাখে। ক্লাইভের সেজ নাতির ন'ছেলের মেয়ের মেয়ে ক্লাসিনা আসছে কাল। পলাশীর প্রান্তরেই তাঁর দাদুর গল্প শুনবে। আমি ছাড়া সে যুদ্ধ চাক্ষুস দেখেছে এমন আর কাকে পাবে বল?

এবার আর শুধু বঙ্কা নয়, টনি, বুজুর সঙ্গে আমার চোখও জোড়া ফুটবল। বিড়বিড় করে বললাম, পলাশীর যুদ্ধ মানে... ১৭৫৭ সালে ফনেদা!

সে ভাবনাকে পাত্তা না দিয়ে ফনেদা বললেন, যাক, দাদাদের কথা জানতে চাস তো পিনে তুই কাল সক্কালে আমার থেকে দাদাগিরির রিসার্চ ওয়ার্কটা নিয়ে যাস। আমি ঠিক ন'টা ন মিনিটে পলাশীর পথে যাত্রা করব। সিরাজকেও বলেছিলাম, ওই সময়টায় যুদ্ধে যেতে। কিন্তু বাথরুম যেতে গিয়ে দেরী করেই মুশকিল করল। যাক, চললাম। সকালে চলে আসিস পিনে।

কোনও কিছু প্রশ্ন করার আগেই গান গাইতে গাইতে ফনেদা হাঁটা দিলেন,

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,

বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!

ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াচে হায় ভারতের দিবাকর!

উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।...

পরদিন দুপুরে আমরা চারমূর্তি ফের এক হয়েছি বোস পুকুরের সান বাঁধানো ঘাটে। আমার হাতে সকালেই নিয়ে আসা ফনেদার গবেষণাপত্র। আমার ওপর ভার পড়েছে সেটা পড়ে শোনানোর। মলাট থেকেই শুরু করছি।

শিকাগোয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থাপনের জন্য অভিসন্দর্ভ।

বিষয় ঃ— আত্মবিস্মৃত বাঙালি এবং বঙ্গীয় দাদা সমাজ

গবেষক :- শ্রী ফণিভূষণ চাকলাদার

ভূমিকা :- বাঙালি জাতি নিজের ইতিহাসকে মনে রাখে না। বাঙালি ভুলতে বসেছে তাদের পূর্বপুরুষ টেনিদা, ঘনাদা, ব্রজদা, পিন্‌ডিদা, নেলেদারা কত মহান দাদারকীর্তি স্থাপন করে গেছেন। তাঁরা অমিত বিক্রমে বিশ্ব শাসনের অধিকারী ছিলেন। যদিও কখনওই তারা প্রচারের আলোয় আসতে চাননি। ব্যাপক প্রচারের পরিবর্তে নিজেদের একান্ত গুণগ্রাহী দল যাঁরা সত্যিই সেইসব কীর্তি কাহিনীর মর্যাদা দিতে পারবে তাঁদের কাছে বলে গেছেন। নিছক আড্ডার ছলে বলে গেছেন। কয়েকজন বাঙালি আত্মসম্মানে বলীয়ান লেখক বাঙালির হারানো ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, রূপদর্শী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অহিভূষণ মল্লিকরা বাঙালির সেইসব গৌরবগাথা গেঁথে রাখার অনেক চেষ্টা করে গেছেন। এছাড়া আমি অভিসন্দর্ভের গবেষক শ্রী ফণিভূষণ চাকলাদার বীর দাদাদের মহৎ সঙ্গলাভ করেছি। তাদের মাহাত্ম্য অনুধাবন করেছি। দাদাদের পাশে পাশে থেকে তাঁদের মুখনিসৃত বাণী শ্রবণ করেছি।

বঙ্গীয় যুবকগণের দায়িত্ব এবং শক্তি

আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস রাখি। বিশেষতঃ আমার দেশের যুবকদলের উপর। বঙ্গীয় যুবকগণের স্কন্ধে অতি গুরুভার সমর্পিত। আর কখনও কোন দেশের যুবকদলের উপর এত গুরুভার পড়ে নাই। আমি প্রায় গত দশ বৎসর যাবৎ সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি—তাহাতে আমার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশিত হইবে, যাহা ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবে। নিশ্চয় বলিতেছি, এই হৃদয়বান উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকগণের মধ্য হইতেই শত শত বীর উঠিবে।

স্বামী বিবেকানন্দ
কলিকাতা অভিনন্দনের উত্তর

ঃ সৌজন্য ঃ
গৌতম চ্যাটার্জী
রিষড়া, হুগলি

জাতীয়তাবাদের আধারে ন'কোটিরও বেশি বনবাসী / গিরিবাসীর সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে কর্মরত অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনায় —

HCS INFOTECH PVT. LTD.

211D/1, Bagmari Road, Kolkata-700054,
(Behind Honey Da
Dhaba of Kankurgachi),
Phone : 033-3095 3537, Mobile : 98314
78952 / 53, 98310-61942.
E-mail : hcsnet@vsnl.com,
info@hcsinfo.com, website :
www.hcsinfo.com

শুভ দুর্গোৎসবের প্রীতি,
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন —

R. K. TRANSPORT CO.

Head Office

Navkaar Parisar,
Pulgaon Naka, Durg (C.G.) 491001
: (0788) 2210409,
Fax : 2210645

বাংলা সাহিত্যে দাদা সাহিত্য সেই কল্লোল যুগ থেকে। তার আগে বিশেষ দাদাগিরি দেখা যায়নি। প্রাক্-রবীন্দ্র যুগে ছিল 'বাবু'র চল। আর রবীন্দ্রনাথের সময় দাদা। ভানুদাদা। জ্যোতিদাদা। বিশ্বকবিকে আদর করে 'রবিদা' ডাকার সাহস দেখায়নি কেউ। কিন্তু একটু একটু করে পাড়ায় পাড়ায় যেমন দাদাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়তে লাগল, তেমন করে সাহিত্যেও। তবে একটা করে 'দা' ছেঁটে দিয়ে আত্মীয়তার মেজাজে ব্রজদা, টেনিদা, ঘনাদা, নোলেদাদের আবির্ভাব হয়। অনেকে মনে করেন, নারায়ণ দেবনাথ মশাইয়ের 'হাঁ-দা ভোঁ-দা'ও দাদাসাহিত্যের অঙ্গ। কিন্তু অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে অনেক গবেষণার শেষে আমি নিশ্চিত যে ওদের আসল নাম 'হাঁ' কিংবা 'ভোঁ' নয়। দাদা নয়, 'নন্টে-ফন্টে'র মতো ওরাও আসলে ভাই।

আমি ফনেদার গবেষণাপত্র পড়ে যাচ্ছি। একটু দম নিতে থেমেছিলাম। কিন্তু বঙ্কা, বুজু, টনি এমন তাগাদা মারতে লাগল যে ফের পড়তে শুরু করলাম।

ইদানীং বাঙালির কাছে যদি তাদের দাদার নাম জানতে চাওয়া হয় তবে সৌরভ, সৌরভ করে পাগল হয়ে উঠবে। সে নাকি ক্রিকেট খেলে মস্ত দাদাগিরি করেছে। কিন্তু সেই দাদাগিরি যে ইডেন উদ্যানের মাঠে অনেক আগেই শুরু হয়েছে সেটা ক'জন বাঙালি আর জানে! ফুটবল কিংবা ক্রিকেট সবেতেই সোনার ইতিহাস আছে সোনার বাংলার।

প্রথমেই শোনা যাক নোলেদার কাহিনী। সেবার ভারতের অবস্থা শোচনীয়। পর পর দুটো টেস্টে হারবার পর নোলেদার তলব হল। কলকাতা থেকে নোলেদা বিমানে চেপে রওনা দিলেন। পৌঁছতেই ক্যাপ্টেন বললেন, ডিয়ার নোলেদা, তুমিই একমাত্র ভরসা। সেসব শুনে নোলেদা বল হাতে নিলেন। নিজেই বল করছেন, নিজেই ক্যাচ ধরছেন। ঘন ঘন হাউজ দ্যাট্ চিৎকার গ্যালারিতে। শেষের ক্যাচটা অভাবনীয়। বলটা ওভার বাউন্ডারি হচ্ছিল। নোলেদা এন্ডে দাঁড়িয়ে স্রেফ হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললেন। রেকর্ড। দশ রানে অল আউট। সেবার নোলেদার ওই বোলিং দেখে অন্যপক্ষের ক্যাপ্টেন জীবনে আর খেলবেন না জানিয়ে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান।

ফুটবলের ইতিহাসেও অমর নোলেদা। একবার নোলেদা টিম নিয়ে আমেরিকায় খেলতে গিয়েছিলেন। খেলার আগে নোলেদার সঙ্গে পেলের সাক্ষাৎ হয়। নোলেদা অবশ্য পেলেদা বলেই ডাকতেন। জানেন কি যে নোলেদাকে ফুটবলের জাদুকর বলেছিলেন স্বয়ং পেলে! সে এক গল্প। সেবার খেলার মধ্যে নোলেদা হঠাৎ হাত দিয়ে দৌড়তে শুরু করেন। বলটা দু'পায়ের মধ্যে বাগিয়ে ধরা। ফাউল তো হতে পারে না। সেই অবস্থায় বনবনিয়ে ছুটে সোজা গোলে। গোটা গ্যালারি গোল! গোল! চিৎকারে ফেটে পড়ছে। মাঠে বসে খেলা দেখে ফুটবল সম্রাট পেলে বলেছিলেন, এমন কায়দা তিনি জীবনে ভাবেননি। গল্প না বললেও জানিয়ে রাখি, নোলেদা একবার বেকেনবাওয়ারের ছদ্মবেশে বিশ্বকাপও জিতেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে নোলেদার আত্মপ্রকাশ সাতের দশকের শেষদিকে। ঘনাদা-টেনিদা-ব্রজদা-ফেলুদা ততদিনে মধ্য গগনে। তারই মধ্যে 'আনন্দমেলা' পত্রিকায় নোলেদার গোপন সব কাহিনী ছবি সহ ফাঁস করে দেন অহিভূষণ মল্লিক। একসময় ব্রজদা, ঘনাদার ছবি আঁকিয়ে অহিভূষণই হয়ে উঠলেন নোলেদা কমিক স্ট্রিপের একক মালিক। রচনা, অঙ্কন সবই তাঁর। ফজলি আমের মতো লম্বাটে মুখ। মাথায় খাড়া খাড়া চুল। তেমনই খাড়া নাক। আর তালগাছের মতো লম্বা হাত। সেটা দিয়েই তো বল করে আবার বাউন্ডারির ক্যাচ লুফতেন।

আমার আর এক দাদার কাহিনীও ঠিক একইভাবে চাটুজ্যেদের রোয়াকে বসে চাক্ষুস শুনেছি। তিনি আমার টেনিদা।

পটলডাঙার টেনিদা। ডাক নামেই এত পপুলার যে তাঁর আসল নাম ভজহরি মুখার্জিকে কেউ চেনে না। দিনের পর দিন বেগুনি আলু কাবলি আর টেনিদার চাটি খেয়েছি আমরা মানে হাবুল, ক্যাবলা এবং প্যালারাম। চারজনকে নিয়েই 'চারমূর্তি'। এদের মধ্যে আমি কোন জন তা প্রকাশ করা গুরুর বারণ। আর এই দলেরই একজন প্যালারাম নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নাম নিয়ে 'শিশুসাথী', 'সন্দেশ' ইত্যাদি পত্রপত্রিকায় টেনিদা এবং আমাদের কীর্তি প্রকাশ করে দিয়েছেন। যাই হোক, আজ বিশ্ববাসীকে মনে রাখতে হবে, ওই চাটুজ্যেদের রোয়াকে বসেই জগৎখ্যাত সেই স্লোগানের জন্ম হয়েছিল। টেনিটা উচ্চগ্রামে বলতেন, 'ডি লা গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস'। আমরা দোহার দিতাম 'ইয়াক-ইয়াক'।

সেসব গল্প জানতে হলে টেনিদার প্রবচন সম্পর্কেও এই গবেষণায় উল্লেখ করা দরকার। কোনও ঘোরালো ব্যাপার মানে 'পুঁদিচ্চেরি' কিছু নিয়ে 'কুরুবক'-এর মতো কেউ বকবক করলে টেনিদা প্রথমে বলতেন 'মেলা বকিসনি'। তারপরও না থামলে কখনও কান পাঠাতেন কানপুরে, নাক নাসিকে কিংবা দাঁত দাঁতনে। ছ'ফুট লম্বা টিয়া পাখির মতো নাকওয়ালা টেনিদার গল্প বলতে গেলে রামায়ণ আর মহাভারত মিলিয়ে মোটা হয়ে যাবে গবেষণাপত্র।

তবে খেলাধূলার ব্যাপারে টেনিদাকে সেরার সেরা বলতেই হবে। একবার চোরবাগানের টাইগার ক্লাবের সঙ্গে পটলডাঙ্গার থাণ্ডার ক্লাবের ম্যাচে ছয়-ছয় ড্র হয়েছিল। সেবার অবশ্য টেনিদার থান্ডার ক্লাবের অতগুলো গোল খাওয়ার একটা কারণ ছিল। গোলকিপার পাঁচুগোপাল ভুল করে নিজের বদলে ওর পিসিমার চশমা পরে মাঠে নেমে যায়। তারপরে আর কী— একসঙ্গে তিনদিকে তিনটে বল দেখতে পায়, ডাইনের বলটা ঠেকাতে যায় তো বাঁয়েরটা গোল হয়ে যায়। সেদিনই টেনিদা সবাইকে জানিয়েছিলেন এক গোপন কথা, ছোঃ, বারোটা গোল আবার গোল নাকি? একবার একাই আমি বত্রিশটা গোল দিয়েছিলুম একটা ম্যাচে।

ম্যাচ হয়েছিল ঘুঁটেপাড়া ভার্সাস বিচালিগ্রাম। গোবরডাঙ্গা থেকে দশমাইল হেঁটে, দুই মাইল দৌড়ে ঘুঁটেগ্রামে টেনিদার মোক্ষদা মাসির বাড়ি। সেখানে বেড়াতে গিয়ে টেনিদা মনের সুখে তালের বড়া খাচ্ছিলেন। তখনই লোকাল ছেলেরা আব্দার করে টেনিদাকে ওদের হয়ে খেলার জন্য। টেনিদা তো প্রথমে রাজিই হননি। বলে দিয়েছিলেন, 'এ বছরে তেমন ফর্ম নেই আমার।' স্থানীয় লোকজন অবশ্য গুণের কদর করতে জানে। শুনে ওরা বলল, 'কী যে বলেন স্যার, আপনি পটলডাঙার টেনিরাম শর্মা— আপনার ফর্ম তো সব কাজে সব সময়েই থাকে। প্রেমেন মিত্তিরের ঘনাদা, হেমেন্দ্রকুমারের জয়ন্ত, শিব্রামের হর্ষবর্ধন— এদের ফর্ম কখনও পড়তে দেখেছেন?' সঙ্গে সঙ্গে টেনিদা, হাত জোড় করে বলেছিলেন, 'ঘনাদা, জয়ন্ত, হর্ষবর্ধনেরা দেবতা— আমি তো স্রেফ নস্যি। ওঁরা যদি গরুড় পাখি হন, আমি স্রেফ চড়ুই।' সিনিয়রদের সম্পর্কে বরাবরই টেনিদার খুব শ্রদ্ধা ছিল। আজকালকার ছেলেদের মতো নয়। একবার টেনিদার সঙ্গে ইয়েতির দেখা হয়েছিল। সেই গল্প শোনাতে শোনাতে টেনিদা বলেছিলেন, ঘনাদা মহাপুরুষ, ইয়েতি কেন— তার দাদামশাইয়ের সঙ্গেও তিনি চা-বিস্কুট খেতে পারেন। সে থাক, পরমপূজনীয় ঘনাদার কথা পরে বলব। এখন সেই ৩২ গোলের গল্প শোনা যাক। সরি, গল্প নয়, ইতিহাস।

মাঠে নেমেই দু'গোল খেয়ে গেছে ঘুঁটেপাড়া। হার নিশ্চিত জেনে টেনিদা মা নেংটিশ্বরীকে ডাকতে শুরু করলেন। ব্যাস। সঙ্গে সঙ্গে কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি। পুকুর, মাঠ ভেসে গেল। সবাই খেলা ছেড়ে মাছ ধরতে ব্যস্ত। দু'দলের একুশ জন খেলোয়াড়, দু'জন লাইন্সম্যান আর তিনশো দর্শক কপাকপ মাছ ধরতে লেগে গেল। খেলোয়াড়রা জার্সি খুলে টকাটক মাছ তুলছে। একা টেনিদা পরপর গোল দিয়ে গেলেন। আর রেফারি মশাই বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছেন।

স্পষ্ট মনে আছে টেনিদা চাটুজ্যেদের রোয়াকে বসে ঝালমুড়ি খেতে খেতে এই ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন। বলেছিলেন, 'কী পেলে, ইউসোবিয়া, মুলার নিয়ে লাফালাফি করিস? জীবনে একটা ম্যাচে কখনও বত্রিশটা গোল দিয়েছে তোদের রিভেরা, জেয়ারজিন্হো? ববি চার্লটন তো আমার কাছে বেবি রে!'

টেনিদার কথা বলা, টেনিদার খাওয়া-দাওয়া সব শুনলেই ট্যাঁরা হয়ে যাবে চোখ। আসলে সাধারণ মানুষের কাছে অসাধারণদের সবকিছুই অবাক করা। আর টেনিদা হলেন অসাধারণদের মধ্যে অসাধারণ। সেই অসাধারণত্ব প্রমাণ করেই টেনিদা একবার নাক কুঁচকে স্কুলের পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সার কথাটা বলেছিলেন, ''নেঃ— নেঃ— রেখে দে! পরীক্ষা-ফরীক্ষা সব জোচ্চুরি! কতকগুলো গাধা ছেলে গাদা-গাদা বই মুখস্থ করে আর টকাটক পাশ করে যায়। পাশ না করতে পারাই সবচেয়ে শক্ত। দ্যাখ না— বছরের পর বছর হলে গিয়ে বসছি, সব পেপারের অ্যানসার লিখছি— তবু দ্যাখ কেউ আমাকে পাশ করাতে পারছে না। সব একজামিনারকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছি। বুঝলি, আসল বাহাদুরি এখানেই।''

সত্যিই, বাহাদুর টেনিদাকে পাশ করানোর সাধ্য হয়নি কারও। স্কুলের ক্লাস টেন-এ তিনি একেবারে মনুমেন্ট হয়ে বসে থেকেছেন— তাঁকে সেখান থেকে টেনে এক ইঞ্চি নাড়ায় সাধ্য কার!

গবেষণাপত্র পড়তে পড়তে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। একই সঙ্গে ব্রহ্মতালুও টনটন করছে। বুজুকে বললাম দাঁড়া, চোখে মুখে একটু জল দিয়েনি। পাশের টিউবওয়েল থেকে চোঁ চোঁ করে এক

পেট খেয়েও নিলাম। বুজু, বঙ্কা, টনিও জল খেয়ে নিলে ফের শুরু হল ফনেদার গবেষণাপত্র দাদাগিরি পাঠ।

আরও এক দাদার নাম এখন বলব, যাঁর কাণ্ড কারখানা শুনলে আপনারা চমকে চ কিংবা ঘেঁটে ঘ হয়ে যাবেন। তিনি হলেন পিন্‌ডিদা। লিডার বটে পিন্‌ডিদা। বলে গেছেন দাদার জীবনীকার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং। অনেকে ভাবছেন পি পূর্বক ইন্ ধাতুকে ডি-প্রত্যয় করে পিন্‌ডি বানানো হয়েছে। কিন্তু তা মোটেও নয়। এই নামের উৎপত্তি অন্যরকম। পিন্‌ডিদার পিতৃ বা মাতৃ বা অন্য কেউ প্রদত্ত নাম প্রদীপনারায়ণ গুপ্ত। সেটাই ছোট করে পি এন ডি। স্বল্প ইংরাজি জানা বিদেশিদের উচ্চারণে 'পিন্‌ডি'তে এসে ঠেকেছে।

সে এক দৃশ্য। ব্রেজিলের মাঠে পিন্‌ডিদার পায়ে বল, জাদুকরের মতো সেই বল পায়ে আটকে নিয়ে তীরের মতো বিপক্ষের দুর্গ ভেদ করতে ছুটছেন আর ছুটছেন। বিপক্ষ দল বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে তার ওপর, কিন্তু কেউ তাঁকে স্পর্শও করতে পারছে না— বল নিয়ে আর পাতলা শরীরটাকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন, তারপর আবার ছুটে চলেছেন। হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ দিশেহারা আনন্দে তারস্বরে তাঁকে উৎসাহ দিয়ে যেন বিপক্ষের গোলের দিকে সবেগে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সেই মাতোয়ারা চিৎকারে আকাশ-বাতাস টইটম্বুর।

— পি-ই-ন্-ডি— পিন্‌ডি-ই— পিন্‌ডি।

এসব গল্প পিন্‌ডিদা বলতেন মাঠের উঁচু ঢিবিটাতে বসে। তন্ময় হয়ে শুনতাম আমরা পাঁচ জন হাবুল, চটপটি, কেবলু, কার্তিক আর সোনা। কোনজন আমি বলাই বাহুল্য যে গুরুর নির্দেশ অমান্য করে তা প্রকাশ করব না। পরীক্ষার ঝামেলা না থাকলে দিনরাতের কম করে সাত-আট ঘন্টা কেটে যেত তাঁকে ঘিরে। সে সময় আমাদের মতো গর্বিত আর কে ছিল? তবে রেগুলার ফাউল কাটলেট বা অন্যান্য খানা দক্ষিণা হিসেবে দিতে হত। পিন্‌ডিদার কথার চাবুক আর বিচারের চাবুক পিঠে পড়লে একটু-আধটু মেজাজ বিগড়োলেও আমরা জানতাম ওই রোগা কুতকুতে চোখের মানুষটা আমাদের তুলনায় হিমালয় বিশেষ। পিন্‌ডিদার সবটা দেখতে হলে ঘাড় উঁচিয়ে অর্থাৎ মাথাটাকে আকাশ-মুখো করে দেখতে হয়— কিন্তু তার পরেও সেই দেখার থৈ মেলে না।

পিন্‌ডিদা গোটা পৃথিবীটাই প্রদক্ষিণ করেছে বলতে গেলে। আফ্রিকা-আমেরিকা-ইংল্যাণ্ড-জার্মানি-রাশিয়া কোনও জায়গা বাদ নেই। তবে ঘুরে ফিরে ওই ব্রেজিলই সব থেকে ভাল লেগেছিল— সেখানেই জীবনের বেশিটা কাটিয়েছেন। ব্রেজিলের মানুষই প্রদীপনারায়ণ দত্ত অর্থাৎ পি এন ডি-কে পিন্‌ডি বানিয়েছিল। বল নিয়ে তীরের মতো ছুটতে গিয়ে বাঁ হাঁটুর চাকতিটা একবার খুলে যায়। তারপর কত অপারেশন, কত কাণ্ড। কিন্তু হাঁটু আর ঠিক হল না। তবু পিন্‌ডি নামটা অমর হয়ে গেল। মামা-মামীর কান্নাকাটিতে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি যখন দেশে পাড়ি দেবেন ঠিক করলেন, তখন ব্রেজিলের ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ কি কান্না, কি কান্না!

পিন্‌ডিদা গোয়েন্দাগিরিতেও কম যাননি। গোপাল ঠাকুরের হিরের চোখ তো একাই খুঁজে বের করেন পিন্‌ডিদা। সত্যি বলছি ফেলুদাও ফেল মেরে যাবেন। রাম বাদশার দলের সঙ্গে সে কী লড়াই, সে কী লড়াই! এই শর্মা মানে গবেষক ফণিভূষণ চাকলাদারও সশরীরে হাজির ছিলেন লড়াইয়ে।

গবেষণাপত্র পাঠ শুনতে শুনতেই হঠাৎ বুজু চোখগুলো গোল গোল করে জিজ্ঞেস করল, সেই লড়াইতেও ছিল আমাদের ফনেদা?

আমি বললাম, ছিল কী ছিল না কী করে বলব? সাহস থাকলে ফনেদাকেই জিজ্ঞেস করিস।

টনি রেগে গিয়ে আমাদের দু'জনকেই চুপ করিয়ে দিয়ে বলল, বুজু একদম বাজে ফোড়ন কাটবি না। তোর সন্দেহ যদি ফনেদা জানতে পারেন, তবে কান টেনে কানাডায় পাঠিয়ে দেবেন।

বুজুর ভ্যাবাচ্যাকা মুখ দেখে সবাই হেসে উঠতেই বঙ্কু বলল, পড়ে যা পিনে পড়ে যা। আমি আবার ফনেদার লেখা পাঠ শুরু করলাম।

এবার আপনাদের ঘনার বচন শোনাব। খনার বচন তো অনেক শুনেছেন, কিন্তু ঘনার বচনের কাছে সেসব পাত্তা পায় না। পুরো নাম ঘনশ্যাম দাশ। আদরের নাম ঘনাদা। তাঁরও একটা দলবল ছিল। সেই দলে ফনিভূষণ চাকলাদার কী নামে ছিলাম গোপন রেখেই বলছি বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়ির দোতলার আড্ডা ঘরেই ছিল ঘনাদার স্থায়ী আসন। সেখানে বসেই তিনি ডান হাত ও মুখের কাজ চালাতেন একসঙ্গে। খানা শেষ হলেই বচন শুরু। আমাদের দলে ছিল শিবু, শিশির, গৌর ও সুধীর। এই সুধীরেরই ভাল নাম প্রেমেন্দ্রনাথ মিত্র। ঘনাদার সঙ্গে থাকতে থাকতে সুধীর একসময় বিশাল মাপের লেখক হয়ে ওঠেন। আর ঘনাদার যত বচন তা ঘটনা, দুর্ঘটনা সহযোগে পাতার পর পাতা লিখে রেখে গেছেন আনন্দমেলার পাতায় পাতায়। ঘনাদার বয়স নিয়ে কেউ কখনও মাথা ঘামায়নি। ঘামানোর সাহসও হয়নি। দুশো বছরে হেন ঘটনা ঘটেনি যার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই। কিন্তু সেটাও সম্পূর্ণ সত্যি নয়। কারণ, কীচকবধে ঘনাদা, জয়দ্রথবধে ভারতযুদ্ধে ঘনাদা কিংবা কুরুক্ষেত্রে ঘনাদাও আমরা শুনেছি। পিঁপড়ের জ্বালায় শ্রীকৃষ্ণকে যে একবার উল্টে শুতে হয়েছিল সেটা ক'জনে আর জানে! মহাভারতে নেই এমন ঘটনাই ঘনার বচনে মিলবে। আরও বিশদ জানতে হলে পড়ে নিন। আমাদের মিত্তির মানে প্রেমেন্দ্র মিত্র 'আনন্দমেলা',

FOR INTERIORS THAT EVOKE ADMIRATION

For over two decades, Centuryply has been effortlessly redefining interiors into designer spaces with the most stunning range of products that reflect the very best of style, innovation and functionality.

CENTURYPLY
Quality that's a class apart!
Fortifying interiors with innovations like the first flexible ply, a 7 year termite-proof, pay back guarantee and many more…

CENTURYVENEERS
Exotic designs in wood!
Beautifying Interiors with an exclusive and wide range of Decorative veneers (only BWR available in India) & Senzura Styles, handpicked from around the world...

CENTURYLAMINATES
Style that stands out!
Trendsetting interiors with the widest range of laminates having myriad textures, stunning patterns and exquisite designs…

Also available:
CENTURYMDF
CENTURYPRELAM

CENTURYPLY®

'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' এসব পত্রিকায় সব লিখেছেন। ঘনাদা সমগ্রও বাজারে আছে। ইংল্যাণ্ডের শার্লক হোমস ক্লাবের মতো কলকাতায় ১৯৮৪ সালে ঘনাদা ক্লাবও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গবেষণাপত্র সেসব বিশদ বলার জায়গা নয়।

অনেকে বলেন, বাঙালি কাজের থেকে কথায় দড়। কিন্তু সেটা যে মোটেও ঠিক নয়, তা বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন স্বয়ং ঘনাদা। তাঁর যেসব কথাকে লোকজন বাগাড়ম্বর বলে মনে করে তা যে কতটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ সেটা বোঝার শক্তি সবার নেই। হয়ও না।

সব মহাপুরুষরা যেমন হন ঘনাদাও তেমন ভোজনরসিক ছিলেন। একবার ঘনাদার সামনে থেকে খাবারের প্লেট সরিয়ে নেওয়ার জন্য ঘনাদার মুখের চেহারা মহাভারতের হস্তিনাপুর থেকে এক ঝটকায় উনিশশো পঁচাত্তরের বাহাত্তরে এসে পড়ার জন্য ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে যায়। খেতে ভালবাসতেন। প্লেট বোঝাই শিক-কাবাব, ফিস ক্রোকেট, হরি ময়রার বাদশাহি শিঙাড়া, কালীঘাটের তোতাপুলি ল্যাংচা প্লেটের পর প্লেট সাবাড় করে দিতেন একাই। তাঁকে উপলক্ষ করে আমাদের পেটপুজোও কম হোত না। তবে কোনও কালেই রান্নায় কোনও আগ্রহ ছিল না ঘনাদার। কিন্তু নানা রেসিপি জোগাতেন বাহাত্তর নম্বরের বাসিন্দাদের। এনিয়ে বিখ্যাত রন্ধন পটিয়সী লেখিকা লীলা মজুমদার একবার প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'ভোজন বিলাসী যিনি তিনি নিজের হাতে পাক না করলেও, যারা করবে তাদের হাড় জ্বালানি ডিটেল সহকারে, রিগা বা মিকিউ বা কংগো বা বোদরুমের এবং বিশেষ করে মঙ্গলগ্রহের পাক-প্রণালীর বিষয়ে প্রশিক্ষিত করবেন না?'

ঘনাদাকে বিশ্বপথিকও বলা যায়। অস্ট্রেলিয়া, জাপান, রাশিয়া, ইউরোপ সর্বত্র গেছেন তিনি। তবে বেশি টেনেছে আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকার রহস্যময় জঙ্গল। প্যাসিফিক আর আতলান্তিক মহাসাগরের কত দ্বীপেও দাপিয়ে বেড়িয়েছেন তিনি। তার থেকেও বড় কথা, ম্যাপে খুঁজে পাওয়া যাবে না এমন কত কত দ্বীপেই শ্রী ঘনশ্যাম দাশের পদধূলি পড়েছে। আর সেসব ইতিহাস-ভূগোল-বিজ্ঞান-রূপকথা-পুরাণ-কল্পনা -সত্যি-মিথ্যে মেশানো কাহিনী শুনতে শুনতে আমরা তন্ময় হয়ে গেছি। আজও তাঁর নাম মনে পড়লে আপনা হতেই আমার করবদ্ধ হাত কপালে ঠেকে।

গোয়েন্দাগিরিও করেছেন ঘনাদা। সেই সঙ্গে কত ধাঁধার উত্তর যে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। একবার কলকাতার কালীঘাটের গঙ্গার যে ধারে আলিপুর কারাগার তার অপর পারে নিজের বাড়ির ঠিকানা বুঝিয়েছিলেন ছড়ার কৌশলে।

নদী না খাল?
তার ওপর শুরু
লম্বা লাল দেওয়াল।
দেওয়ালের ওখানে কারা?
ওখানে রইল ইশারা।
এখন খুঁজলে বাড়ি
পাবে তাড়াতাড়ি।

তাঁর কথা বলে শেষ করা যায় না, তবু বিশ্ববাসীকে মনে রাখতে হবে তিনিই প্রথম ফাঁস করে দেন যে শ্রীশ্রী গণেশ মহোদয়কে দিয়ে কোন কার্যোদ্ধার করতে হলে তাঁর বাহন ইঁদুর বাবাজিকে মোটা ঘুষ খাওয়াবার দস্তুর দাঁড়িয়ে গেছে, ফলে ঘুষ খেয়ে খেয়ে মূষিকপ্রবর বন্য বরাহের মতো বপু ধারণ করেছে। তিনিই প্রথম জগৎ সংসারকে জানান যে, মালাঞ্জা এম্‌পালে নামে এক দস্যু পৃথিবীকে আরও বড় করার মতলব এঁটেছে। সাংকুর নদীর ধারে এম্‌বুজি মাঈ থেকে চোরাই হিরে পাচার করার জন্য ইতুরির গহন বনে ঘনাদাকে মারার চেষ্টা করেছিল। সে যাত্রায় ঘনাদা তো বেঁচেছিলেনই সেই সঙ্গে পৃথিবী আরও বড় হলে দুনিয়ার যে দুর্দশা হত তা রোধ করতে পেরেছিলেন।

বাঙালির এই ইতিহাস বাঙালি কতটা মনে রেখেছে জানি না। তবে আমরা চেষ্ট করেছিলাম। ঘনাদাকে যাতে ঠাঁইনাড়া হতে না হয় সেজন্য বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মেস বাড়ি মেরামতের জন্য বছরের পর বছর কোনও রাজমিস্ত্রি লাগানো হয়নি, চুনকাম করা হয়নি। ঘনার বচন শোনার জন্য ঘনাদাকে সিগারেটের পর সিগারেট ধার

দিয়ে গেছে শিশির। ২৩৫৭টা সিগারেট ধার দেওয়ার পর সে শোধ পাওয়ার আশা ছেড়ে হিসেব রাখাই বন্ধ করে দেয়।

এবার বলি আমার বড় দাদা ব্রজদার কথা। স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে চার চারবার যিনি শহিদ হয়েছেন। এমন রেকর্ড ভূ-ভারতে আর কারও নেই। এমন শুনে আমরা বিস্মিত হয়ে গেলে তিনি বলেছিলেন, বৃটিশের খাতায় তাঁকে হত্যা করে লেখা হলেও তিনি গোপনে বেঁচে পালিয়ে যেতেন। এই গবেষণাপত্রে তাঁর গুণের একটা হালকা পরিচিতি দেওয়া যায়। গোটা জানতে গেলে রূপদর্শী বর্ণিত গুল্পসমগ্র পড়ে নিতে হবে। রূপ সেসব কথা 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক লেখার পর পুস্তকাকারে শিব্রাম চক্করোবরতিকে উৎসর্গ করে যান।

তবে তাতেও যে সবটা আছে তা নয়। কারণ, ও বই পড়ে ব্রজদারই মন ওঠেনি। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, 'ফ্যাক্টটুকুই যা বলেছি, তার সিকিটুকু ও ফোটাতে পারেনি। এর উপর যদি একটু গুল চড়াতুম তবে সে তো ওর কলমের রেঞ্জেই পৌঁছত না।'

সেই ফ্যাক্টেরই কিছু কিছু নমুনা দেওয়া যেতে পারে এই গবেষণাপত্রে। তবে কারও যদি অবিশ্বাস হয় তবে সে দায় তাঁর। ব্রজদাই একবার বলেছিলেন, 'বাঙালির মানসিক হজমশক্তি আর আগের মতো নেই। কোনও কিছু প্রাণে ধরে বিশ্বাস করতে পারে না। আর যেদিন থেকে বাঙালির এই হজমের গোলমাল হয়েছে, সেদিন থেকেই তার অধঃপতনের শুরু।'

শ্রীনগরে বেড়াতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোটের সঙ্গে ব্রজদার বোটের ধাক্কা এবং কবির খাতা জলে পড়ে যাওয়া এবং তা ব্রজদার বাঁচিয়ে দেওয়ার ইতিহাস অনেকেই জানেন। তাহলে এটাও নিশ্চয়ই জানেন, বোটের ছাদে বসে দিনের পর দিন রবি ঠাকুরকে কবিতার প্লট সাপ্লাই করতেন ব্রজরাজ কারফর্মা। তাঁরই দেওয়া সূত্রে বলাকা কাব্যগ্রন্থ। এছাড়াও নিজের কোমরের তলোয়ার দেখিয়ে ব্রজদা একবার বলেছিলেন, এটি ঠিক যেন ঝিলমের বাঁকা স্রোতেরই মতো।

কবি চমকে উঠলেন। দি আইডিয়া। থ্যাঙ্ক ইউ ব্রজ। পেয়ে গেছি। ইউরেকা। ফস্ ফস্ করে লিখে ফেললেন,

সন্ধ্যারাগে-ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার.....

সাহেবদের প্যারেড করা শেখানো, বৃটিশদের হয়ে গোয়েন্দাগিরি এসব তো আছেই, সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, বঙ্কিমচন্দ্রকে কপাকুণ্ডলা লেখবার ফ্যাক্ট জোগাড় করে দিয়েছেন, মাইকেলকে প্রাইভেট পড়িয়েছেন, বিদ্যাসাগরকে বিধবা বিবাহ আন্দোলনে সাহায্য করেছেন, রামমোহনকে বিলাত যাবার টিকিট কিনে দিয়েছেন, পেরি সাহেবকে বাংলা টাইপের নক্সা এঁকে দিয়েছেন, জোব চার্নককে... এসব বলে শেষ করা যাবে না।

গোরাদের সঙ্গে খেলায় মোহনবাগানকেও তো উনিই জিতিয়েছিলেন। সে কাহিনী ব্রজদার মুখের কথাতেই শোনা যাক। ''আমার তেমন খেলবার ইচ্ছে ছিল না এবার। বাঁ হাঁটুর মালাটা ভেঙে একদম চুরমার হয়ে গিয়েছিল কিনা। হাঁটতেও কষ্ট হোত। কিন্তু গোরাদের সঙ্গে খেলা তো, রিস্ক নেওয়া যায় না। গোষ্ঠ (গোষ্ঠ পাল) একা সাহস পায় না। বারবার করে বললে, ব্রজদা, তুমি না খেললে এবারে গেলুম। তাই রাজি হয়েছিলাম। হেরে গেলে তো ন্যাশনাল প্রেস্টিজটা একেবারে ডকে উঠবে, বুঝলিনে। তাছাড়া সন্তোষের মহারাজার পার্সোনাল রিকোয়েস্ট, কিছুতেই না করতে পারলুম না। গোটা চারেক নিক্যাপ পরে মাঠে নামলুম। গোষ্ঠ ব্যাক। আমি রাইট ইন, গোষ্ঠ লাইন থেকে শট্ ঝেড়ে বল কর্ণারে পাঠায় আর আমি সেই ডান দিকের বল বাঁ পা দিয়ে ধরে সঙ্গে সঙ্গে কোণাকুণি নিচু শটে নেট্ করি। হাফ টাইমের আগেই পর পর চার বার। ওদের গোলি আমার এই নতুন কৌশল ধরে ফেলার আগেই দেখা গেল, ফোর টু নিল।''

গোয়েন্দা ব্রজদা, পর্বতারোহী ব্রজদা, পুরাতত্ত্ববিদ ব্রজদা, ক্যামেরাম্যান ব্রজদা, সাংবাদিক ব্রজদা, আরও আরও কত ব্রজদা জানতে হলে গুল্পসমগ্রই পড়তে হবে। কিন্তু খেলোয়াড় ব্রজদার কথাটুকু এখানে বলতেই হবে। না, আমি বলব না। ব্রজদার মুখ দিয়েই বলাব। তার আগে ব্রজদার মুখেই শুনে নেওয়া যাক ব্রজদা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে সাক্ষাৎকারের ঘটনা।

''... যত দিন দেশ পরাধীন ততদিন দেশ স্বাধীন করার জন্য ছটফট করেছি। একদিন কাঁঠালপাড়ায় গিয়ে বঙ্কাদাকে বললুম, দাদা, একটা লাগসই গান লিখে দিন তো, যাতে দেশ একেবারে মেতে ওঠে। ঋষি বঙ্কিম কী গানই লিখলে মাইরি। মরি মরি মরি। গান মানে গানের কথাগুলো। সঙ্গে সঙ্গে দেশমল্লারে সুর করে বঙ্কাদার উঠোনে দাঁড়িয়েই গেয়ে শুনিয়ে দিলুম : বন্দেএ এ-মা আ আ তর্ অ অ অ অ ম্। বঙ্কাদা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন। আবেগভরে বলে উঠলেন, 'ভবানন্দ, তুমিই ধন্য।' আমার সন্তান-নাম ভবানন্দই ছিল। বন্দেমাতরমের পরের হিস্ট্রি তোরা তো জানিসই। তারপর থেকে ইংরেজ তাড়াবার জন্য পরবর্তী জীবনে কত কীই না করলাম? দমাদ্দন বোম ছুঁড়েছি, মশার পিস্তর থেকে সটাস্সট্ গুলি। ইংরেজরা আমাকে তো নম্বর ওয়ান শত্রু বলে ডিক্লেয়ার করেছিল।''

আমরা মানে সুনীত ঘোষ, সুনীল বোস, যদুরা তন্ময় হয়ে শুনেছি সেসব কথা। আপনাদের শোনানোর লোভ সামলানো যাচ্ছে না। তার আগে জানিয়ে রাখি, ব্রজদা দু'হাতেই বল করতেন। ডান হাতে ফাস্ট বল আর বাঁ হাতে স্পিন।

এই যে ইণ্ডিয়া ক্রিকেটে বিশ্বকাপ পেল তা অনেক অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিল সাহেবরা। একবার সাহেবদের সঙ্গে খেলায় ব্যাট হাতে ব্রজদা যে কীর্তি স্থাপন করেছিলেন তাতেই সাহেবরা বুঝেছিল। সেবার দারুণ লড়াই। একের পর এক উইকেট পড়ে যেতে সিক্সথ ম্যান হিসেবে নামলেন ব্রজদা। বোলাররা বুনো ওল তো ব্রজদা বাঘা ট্যারামিন। ছয়ের পর ছয়। বোলার বাম্পার দিলে ব্রজদার জাম্পার শট্। সেই শটে বল উপরে গিয়ে আকাশের নীলিমায় একেবারে বিলীন হয়ে গেল। সবাই হাঁ হয়ে আছে। পিন ড্রপ সাইলেন্স। শুধু খুব দূর থেকে, বোধ হয় চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারার কোলের কাছ থেকে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বেতার তরঙ্গে ভেসে উঠতে লাগল। বিপ্ বিপ্ বিপ্। এটা কি বাউন্ডারি, ওভার বাউন্ডারি, না সুপার বাউন্ডারি। আজও তার মীমাংশা হয়নি।

পঁচিশ মিনিট অপেক্ষার পর নতুন বল নিয়ে খেলা শুরু হল। নেক্সট বলে আরেকটা পাজল্। সেটা আরও মোক্ষম। মারের চোটে বলটা ফট্ করে নারকোলের মালার মতো দু'টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। অর্ধেকটা একজন ফার্স্ট স্লিপে ক্যাচ ধরে ফেলে আর বাকি অর্ধেকটা ওভার বাউন্ডারি হল। আবার খেলা বন্ধ করে কনফারেন্স বসল। এটা কি আউট না ছয়! আজও ফয়সালা হয়নি।

ব্রজদা বলে গেছেন, যদি কারও অবিশ্বাস হয় তবে সে যদি চান্স পায় তবে যেন অরিজিন্যাল বৃটিশ ক্রিকেট ম্যানুয়ালখানা খুলে দেখে। সেখানে 'ব্রজদাস্ পাজল্' সব লেখাও আছে। সেই সময় মাঠে হাজির জার্ডিন সাহেব বলেছিলেন, ''একজনের জন্য তো রুল হয় না। তোমাকে গ্রেট বললে ছোট করা হয়, ইউ আর ডাবল গ্রেট। দুঃখ এই, তোমার আর জুড়ি জন্মাবে না, তাই ক্রিকেটে এই থার্ড ডাইমেনশন আর আনাও যাবে না, আমাদের চিরকাল বাউন্ডারি আর ওভার বাউন্ডারি নিয়েই তুষ্ট থাকতে হবে। তবে তোমার যে মারে বল আকাশে মিলিয়ে যায়, সেটা হিস্ট্রিতে ব্রজদাস্ পাজল্ বলে আবহমান কাল ধরে লেখা থাকবে।''

আমি পড়ে চলেছি মন দিয়ে। সমান মন দিয়ে তন্ময় হয়ে শুনছে বুজু, বঙ্কা, টনি। আচমকা বঙ্কার চিমটিতে আঃ বলে চেঁচিয়ে মুখ তুলেই দেখি ফনেদা দাঁড়িয়ে। চুইংগাম চিবোতে চিবোতে জিজ্ঞেস করলেন, কী পড়ছিস রে পিনে?

তোমার দাদাদের নিয়ে গবেষণাপত্র।

ফস্ করে আমার হাত থেকে কাগজের গোছাটা টেনে নিয়ে বললেন, অনেক পড়েছ বাবা, আর পড়তে হবে না। বাড়ি গিয়ে পাটিগণিত মুখস্থ করগে যাও। দাদাদের কাহিনী বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। না হলে লাইব্রেরিতে গিয়েও তো একটু খোঁজ করতে পার। তাতে মগজের গোবরগুলো তো একটু সার পায়! বিদিশি বই দেখে জিভের জল না ফেলে একটু আধটু দিশি ইতিহাস তো ঘাঁটতে পারিস রে কেঁচোর দল। পারলে টেনিদাকে নিয়ে 'চারমূর্তি' আর ব্রজদাকে নিয়ে 'ব্রজবুলি' সিনেমাটাও দেখে নিস। তবে বই পড়াই ভাল। সিনেমায় ওঁদের ঠিক ধরতে পারেনি।

আমরা সবাই চুপ। কাউকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বক্তার ঢঙে ফনেদা বলে চললেন।

এই যে ক্লাইভের সেজ নাতির ন ছেলের মেয়ের মেয়ে ক্লাসিনার সঙ্গে কথা বলে এলাম। কি চৌকস মেয়ে, ফুটফুটে বুদ্ধি। কথা শুনে চোখ জুড়িয়ে যায়। আমাকে বললে, ফনেদা, আই গ্রেটফুল টু ইউ। আমি বললাম, আমাকে গ্রেটফুল বলতে হবে না। আমাদের কালচারটাকে বল। এ দেশের সম্পদ হচ্ছে কালচার। অপরকে আলো দেখানোর কালচার।

মুশকিলটা কি জানিস বঙ্কা, তোদের মধ্যে অবিশ্বাসের বীজ পোঁতা আছে। অস্থি, মজ্জায় তার শেকড় বাকড়ও আছে। নিজের দেশ নিজের, ইতিহাসটাকেই তোরা বিশ্বাস করিস না। দাদাকাহিনী পড়ে তোরা মজা পাস। মর্মটা নিতে পারিস না। জাতিকে আত্মগর্বে বলীয়ান করার জন্য এসব কাহিনী বলে গেছেন তাঁরা। মজার ছলে বলেছেন মজা করার জন্য নয়।

শোন তবে সব দাদার বড় দাদা ব্রজদার কাহিনী। সেবার বৃটিশ কুস্তিগির পালোয়ান কর্ণেল ক্লিম্যান্টকে ফোর্ট উইলিয়ামে হারিয়েছিলেন ব্রজদা। জয়ের পর বিপুল উচ্ছ্বাসের সে গল্প বলেছিলেন ব্রজদা।

বড়লাট-গিন্নি ব্রজদার গলায় মেডেলটি পরিয়ে দিয়ে কিসটি করবার জন্য ব্রজদার মুখখানা যেই ওর পাউডার পমেটম মাখা মুখের কাছে টেনে নিলেন, অমনি ব্রজদা বেঁকে বসলেন।

ব্রজদা বললেন, সরি ম্যাডাম! আই কান্ট টেক ইট। ওটা নিতে পারব না।

মেম-সাহেব বড়লাটের বউ। এমন কথা জন্মে শোনেননি। ওঁর কাছে এটা তোর রীতিমতো বেয়াদবি। অবাক হয়ে ব্রজদার মুখে দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর চটে ফায়ার।

বললেন, কেন?

বুক ফুলিয়ে ব্রজদা বললেন, ম্যাডাম ওটা ফরেন গুড্স। এখন স্বদেশি আন্দোলন চলছে। বিলাতি মাল আমরা বয়কট করেছি কিনা।

আমরা সবাই কী বলব বুঝতে না পেরে ফনেদার মুখের দিকে চেয়ে আছি। আর দেখলাম ফনেদা ইউ টার্ন করে হাঁটা ধরল। বাঁ হাতে গবেষণাপত্র, ডান হাত আকাশ পানে তোলা। হাঁটা ধরলেন বড় রাস্তার দিকে। একটু একটু করে মিলিয়ে গেল ফনেদার গাওয়া গানের সুর...

বল বল বল সবে, শত বীণা বেণু রবে, ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে.... □

With Best
Compliments From :

BSN INDUSTRIES

P R I V A T E   L I M I T E D

An ISO / TS - 16949 / 2002 & ISO 9001: 2000
Certified Company

B-201A, Phase - II, Noida, U.P. - 201305

Phone No. - +91 1202568118, +91 1202462119

Fax : +91 120 4219251

E-mail : bsn@bsnindustries.com; Website - www.bsnindustry.com

Manufacturers & Exporters
of

Crankshafts